বুদ্ধদেব বসু

দুই ঢেউ, এক নদী

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬৭

আড়াই টাকা

'ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস'—মুদ্রাকর শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
১৯/এ/এইচ/২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক—
শ্রীকিরীটিকুমার পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা

পরিচয়পত্র চিত্রণ—
শ্রীবলাইবন্ধু রায়

প্রচ্ছদপট অঙ্কন—
শ্রীবীরেন দে

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
সৌজন্যে প্রাপ্ত পুস্তনি-আলেখ্য—
"সমুদ্র ও নদী"
এঁকেছিলেন—
স্বর্গত জগৎমোহন সেন

পরিকল্পনা—
শ্রীসত্যনারায়ণ দে

একমাত্র পরিবেশন কেন্দ্র—
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
ব্লক সি, রুম ৩
কলিকাতা-১২

"দুই ঢেউ, এক নদী"

'পারিবারিক' উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ

—বু. ব.

দোতলায়, রাস্তার ধারে জানলায় ব'সে টুনকি বিকেলের দিকে তার ছোটো-ছোটো ধারালো দাঁত দিয়ে একটা কাঁচা পেয়ারা ঠুকরে খাচ্ছিলো, এমন সময় তার মনে হ'লো তাদেরই বাড়ির দরজায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো।

দাঁতের ক্রিয়া তখনকার মতো স্থগিত রেখে টুনকি ঘাড় উঁচু ক'রে তাকিয়ে দেখলো—আরে, তা-ই তো! কে এলো? টুনকি এক মুহূর্ত ভাবতে চেষ্টা করলো, কে। কিন্তু তার পরেই গাড়ির দরজা খুলে যে-লোকটি নামলো তার উপর চোখ পড়ামাত্র ধুপ ক'রে নামলো টুনকি জানলা থেকে এক লাফে।

—'দাদা এসেছেন, দাদা!'

দুমদাম ক'রে নামলো সে সিঁড়ি দিয়ে, সামনের আঙিনাটুকু পার হ'য়ে একেবারে রাস্তায়। সুমন্ত্র ততক্ষণে নিজের হাতেই তার বিছানা-বাক্স নামিয়েছে, চুকিয়ে দিচ্ছে গাড়োয়ানের পাওনা।

'মোটে চার আনা বাবু ?'

'আবার কত ?'

'পঙ্খীরাজ ঘোরা ছুটাইয়া আইলাম।'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো। 'আচ্ছা, নাও তবে,' ব'লে আরো একটা আনি দিলে। গোলাপি গেঞ্জি-পরা গাড়োয়ান দাঁত বের ক'রে হাসলো একবার, তারপর লাগামে টান দিয়ে জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে তাদের চির-অভ্যস্ত শব্দটা করলে, বর্ণমালার চিহ্নে যেটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাড়ি চ'লে গেলো।

টুনকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এইবার কাছে এসে সলজ্জ-ভাবে বললো : 'কী করলে দাদা, একেবারে পাঁচ আনা দিলে !'

'কেন, বেশি দিয়েছি নাকি ?'

'বেশি না !' ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে টুনকি ব'লে উঠলো, 'আজকাল ইস্টিশান থেকে দশ পয়সায় আসে যে !'

'তা-ই নাকি ?'

সুমন্ত্র আর-কিছু না-ব'লে তার বাক্স-বিছানা তুলে নিলো। টুনকি ব্যস্ত হ'য়ে বললো : 'ওগুলো থাক দাদা, মহেন্দ্র এসে নিয়ে যাবে।'

'এর জন্যে আর মহেন্দ্রকে লাগবে না, চল।'

ঘাসের আঙিনাটুকু পার হ'য়ে দু-জনে উঠে এলো একতলার খোলা বারান্দায়। দাদার আগমন-সূচক টুনকির চীৎকার ঘুমের মধ্যেও বিজয়ার কানে পৌঁচেছিলো। ঘুম তাঁর হালকা হ'য়ে এসেছিলো এমনিতেই, ওঠার প্রায় সময় হয়েছে। ধড়মড় ক'রে উঠে দু-একবার চোখ রগড়ে আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সুমন্ত্র তাঁর কাছে এসে জিনিশগুলো নামিয়ে

চুপ ক'রে দাঁড়ালো। প্রণাম করলো না, কোনোদিনই সে প্রণাম করে না, প্রণাম করার অভ্যেসই তার নেই।

বিজয়ার বড়ো ইচ্ছে হ'লো, একবার ছেলের গায়ে-মাথায় একটু হাত বুলোন, কিন্তু কী যেন, পেরে উঠলেন না। ছলোছলো ভরা চোখে তাকিয়ে বললেন : 'এলি ?'

'এলাম।'

'পয়লা তারিখ আসবি লিখেছিলি ?'

'কলেজ ছুটি হ'তে দেরি হ'লো।'

'ও !' তারপর একটু চুপচাপ।

'পথে—ভিড় হয়েছিলো ?' আবার বললেন বিজয়া।

'হয়েছিলো—বেশি না।'

বিজয়া চুপ ক'রে ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন।

'রোগা হয়ে গেছিস।'

সুমন্ত্র নিজের কব্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললো : 'কই, না তো।' বারান্দা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে ছোটো একটা ঘর, সেখানে এসে সুমন্ত্র হাতের কাছে যে-চেয়ারটা পেলো তাতেই ব'সে পড়লো। এককালে তারই ঘর ছিলো এটা। কিছুদিন আগেও ছিলো। ঐ জানলার ধারে টেবিলে ব'সে-ব'সেই সে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া তৈরি করেছে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে ঐ খাটেই মশারির নিচে বই নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনো রয়েছে তার খাট, তার টেবিল-চেয়ার, দেয়ালের আলমারিতে তার অধীত বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ পেন্সিল-অঙ্কিত একরাশি পাঠ্যকেতাব।

'তোর ঘর এখন ফাঁকাই প'ড়ে থাকে,' একটু ইতস্তত ক'রে বিজয়া বললেন। 'মাঝে-মাঝে পিণ্টু শোয়; তাছাড়া বাড়িতে কেউ এলে-টেলে—'

'তা পিণ্টু তো এ-ঘরে থাকতে পারে আজকাল।'

'উপরের বারান্দাতেই পিণ্টুর জায়গা ক'রে দিয়েছি। ওখানেই পড়ে, ওখানেই শোয়।' একটু চুপ ক'রে থেকে, একটু যেন ভেবে বিজয়া বললেন: 'পিণ্টুর আবার একটা ঘর! বাড়িতেই থাকে না, সারাদিন বাইরে-বাইরে।'

'ও! খুব ঘুরে বেড়ায় বুঝি?'

'আর কিছুই করে না। নতুন সাইকেল শিখেছে, চাকার উপরেই আছে। আবার বয়স্কাউটের দলে ভর্তি হয়েছে—তারও তাড়না কম না।'

'রাইবেশী নাচও নাচে নাকি?' ব'লে সুমন্ত্র নিজের মনেই অস্ফুটে হেসে উঠলো। একটু পরে বললো, 'ওর না কোন ক্লাশ হ'লো এবার?'

'ক্লাস এইট হ'লো। হু-হু ক'রে ম্যাট্রিকুলেশন এসে পড়বে।'

'তা সময় তো কাটেই।'

'এবার অ্যানুয়েলে আবার অঙ্কে ফেল করেছিলেন শ্রীমান।'

মৃদু হাসলো সুমন্ত্র: 'অঙ্কে তো আমরা সবাই পণ্ডিত।'

'তা শোন—ফেল ক'রে তো ভেকু-ভেকু মুখ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। তোর বাবাকে বললে—হেডমাস্টার বললেন তুমি একবার গিয়ে দেখা করলে—ওঁকে তো জানিস, ও-সব ওঁর ধাতে নেই। ব'লে বসলেন, বেশ, ফেল করেছো, থাকো আর-একবছর ঐ ক্লাশেই। আমি কত বোঝালুম—তোমার মুখের একটা কথার জন্য ছেলেটার একটা বছর নষ্ট হবে! তা উনি তো কিছুতেই গেলেন না। দু-দিন পর ছেলে লাফাতে-লাফাতে এসে বললো: প্রোমোশন পেয়েছি।'

'দিলে প্রোমোশন ? আমাদের সময়ে কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলে বেজায় কড়াক্কড় ছিলো।'

'শোন না। ওঁর সঙ্গে পরে একদিন হেডমাস্টারের কোথায় যেন দেখা। পিণ্টুর কথা উঠলো। হেডমাস্টার বললেন: ও আমাদের সুমন্ত্রর ভাই ব'লেই প্রোমোশন দিলুম। কেমন আছে আপনার বড়ো ছেলে ?' কথাটা ব'লে বিজয়া সুমন্ত্রের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

সুমন্ত্রও একটু হাসলো। তারপর হঠাৎ বললে, 'উঃ, কী গরম !'

'গরম না ? বিজয়া চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'একখানা পাখা নিয়ে আয় তো, টুনকি, একটু হাওয়া করি।'

সুমন্ত্র ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'পাগল নাকি ? হাওয়া করবে কী !'

বিজয়া হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি না করলাম, টুনকিই করুক।'

'না, না, কাউকে হাওয়া করতে হবে না, কেউ হাওয়া করলে আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগে।'

ততক্ষণে টুনকি কিন্তু একখানা পাখা হাতে ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়া পাখাটা নিয়ে দু-একবার হাত নাড়তেই সুমন্ত্র এক ঝাপটায় ব'লে উঠলো, 'আঃ, করো কী! বলছি ও-সব ভালো লাগে না।'

বিজয়া তক্ষুনি পাখাটা রেখে দিয়ে বললেন, 'তাহ'লে থাক বাপু।'

একটু লজ্জিতভাবে বললো সুমন্ত্র, 'এই তো দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে।'

বিজয়া আস্তে বললেন, 'তুই আসবি জানিনে তো—তা মাছ-

তরকারি সব আছে, দুটো ভাত ফুটিয়ে দিই গে। স্নান করতে হ'লে ক'রে আয়।'

'আমি তো খেয়ে এসেছি স্টিমারে। স্নানও করেছি।'

'আহা—ও-সব খাওয়াতে নাকি আবার পেট ভরে!'

'ভরে না! যা খেয়েছি, বাব্বাঃ!'

এতক্ষণে টুনকি একটা কথা বললো, 'কী খেয়েছো, দাদা?'

'ওঃ, কত কী! অত খাওয়াও যায় না। আচ্ছা মা, স্টিমারে কী চমৎকার কাঁটা-ছাড়ানো ইলিশ দেয়, তোমরা ও-রকম রাঁধতে পারো না? কী নরম, মুখে দিলে গ'লে যায়।'

'কী যেন রে, ও-রকম আমরা তো কখনো রাঁধিনি। জলে সেদ্ধ ক'রে কুশ দিয়ে কাঁটা ছাড়ায় শুনেছি। মাছটাকে আগেই অতক্ষণ ধ'রে সেদ্ধ করলে কী আর স্বাদ থাকে ছাই।'

'থাকে না! চমৎকার হয় খেতে। ও-রকম তোমরা পারো?'

কথাটা খচ ক'রে বিজয়ার মনে বিঁধলো। মনে পড়লো এই সেদিনও মন্তু বলেছে, 'মা, যত জায়গাতেই খাই, তোমার রান্নার মতো অত ভালো কিছুই লাগে না।'

'হস্টেলের ঠাকুর কেমন রাঁধে রে?' একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন।

'ওঃ, হস্টেলের আবার খাওয়া! দু'চক্ষে দেখতে পারিনে এই ঠাকুরগুলোকে। তোমরাও তো একটাকে পুষছো। একটা বাবুর্চি রাখলে পয়সা দিয়ে সুখ। সত্যি রাঁধতে জানে।'

'আহা—কত যেন বাবুর্চির রান্না তুই খেয়েছিস!'

'কেন, কলকাতার সব হোটেলে তো ওরাই রাঁধে।'

'হোটেলে খুব খাস বুঝি?'

'তা—খেতে হয় বইকি মাঝে-মাঝে।'

'অসুখ করে না ?'

'অসুখ করবে কেন ?'

'হোটেলগুলোতে তো সব যা-তা দেয়—কুকুরের মাংস, সাপের চর্বি—'

'তা কেন হবে ! বড়ো-বড়ো হোটেল—শহরের সেরা লোকেরা আসে সেখানে, সাহেব-মেম আসে। আলাদা কাণ্ড সেখানকার !'

'খুব সুন্দর বুঝি ?' টুনকি জিগেস করলো।

কিন্তু টুনকির প্রশ্ন চাপা প'ড়ে গেলো বিজয়ার মন্তব্যে :

'বলিসনি ঐ সাহেব-মেমগুলোর কথা। ওদের কি কোনো ঘেন্নাপিত্তি আছে, না বাছ-বিচার আছে ! যা পায় তা-ই তো গোগ্রাসে গেলে।'

'তাই তো, তাই তো !' মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো সুমন্ত্র। 'যা-তা খায় ব'লেই তো ওদের অমন স্বাস্থ্য ! যা বোঝো না, তা নিয়ে কেন কথা বলো ?'

'বেশ, বেশ, সবই তুই বুঝিস। তাহ'লে এখন আর কিছু খাবি না ?'

'চা খেতে পারি একটু।'

'চা ! আর-একটু বেলা পড়ুক, কেমন ? এখন একটু সরবৎ ক'রে দিই, ঘোলের সরবৎ—'

'না, না—তোমাদের ঐ সরবৎ-টরবৎ আমি কোনোদিন খাই না, জানো না ? যা বলছি তা-ই করো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়া বললেন, 'কী খাবি চায়ের সঙ্গে ?'

'যা দাও।'

'লুচি ?'

'লুচি—খেতে পারি।'

'আর বেগুনভাজা?'

'অত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগেস কোরো না তো, মা, যা হয় এনে দাও।'

বিজয়া দ্বিরুক্তি না-ক'রে চ'লে গেলেন।

সুমন্ত্র চেয়ার থেকে উঠে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিক কেমন চুপচাপ, নিঃসাড়, নিশ্চেতন যেন। জানলা দিয়ে একটুখানি রাস্তা চোখে পড়ে। যতদিন সে ও-ঘরে কাটিয়েছে, ঐ রাস্তাটার বিষয়ে বিশেষ-কিছু ভাবেনি। আজ লক্ষ্য করলো, কী সংকীর্ণ ঐ রাস্তা, কেমন বিবর্ণ মেটে রঙের। আর হঠাৎ উপলব্ধি করলো যে সে ঢাকায় এসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলো, টুনকি সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কাছে ডেকে বললে, 'কী, কেমন আছিস?'

টুনকি চুপি-চুপি বললো, 'দাদা, কলকাতা কেমন?'

'খুব সুন্দর।'

'আমাকে নিয়ে যাবে একবার?'

'যাবি তুই?'

'কী ক'রে যাবো?'

সুমন্ত্র একটু ভেবে বললো, 'বড়ো হ'য়ে যখন কলেজে পড়বি, তখন যাবি।'

'কই, দিদি তো এখানেই পড়ছে।'

'তুই বলিস বাবাকে কলকাতায় পড়বি।'

টুনকি হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলো।—'না, বাবাকে বলবো না। তুমি নিয়ে যাও তো যাবো।'

সুমন্ত্র ওর ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বললো, 'আজ স্কুল ছিলো না ?'

'ছিলো তো। আজ কিনা শনিবার—'

'ও, আজ শনিবার।'

আজ শনিবার, মায়ারা আজ শিলং চ'লে গেলো। আজ শনিবার। সুমন্ত্র খাট থেকে নামলো, নিয়ে এলো স্যুটকেসটা ঘরের মধ্যে।

'ওটা একটু খুলবে, দাদা ? দেখবো ?'

'ছাখ।'

কিন্তু সুমন্ত্রর বাক্সে আশ্চর্য লোভনীয় কোনো সামগ্রী নেই। মামুলিরকমের জামাকাপড়, প্রসাধনের টুকিটুকি, খান দুই বই। ডালার সঙ্গে লাগানো কাপড়ের খাঁজ ঘেঁটে-ঘেঁটে সুমন্ত্র ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বের করলো। তাতে মেয়েলি ছাঁদে লেখা :

The Pines

Shillong

অতি সহজ ঠিকানা, ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তবু সুমন্ত্র ঐ কাগজটুকু রেখেছে, তবু সুমন্ত্র কয়েকবার ঐ লেখাটুকু পড়লো। তারপর আবার ভাঁজ ক'রে রেখে দিলো খোপে।

—'কী সুন্দর গন্ধ, দাদা, তোমার বাক্সে।'

'গন্ধ—না ?' সুমন্ত্র কাপড়ের তলা হাৎড়ে-হাৎড়ে ছোট্ট একটি নীল রঙের শিশি বের করলো।

'এসেন্স !' টুনকি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

'নে,' হাত বাড়িয়ে বললো সুমন্ত্র।

টুনকি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'নে এটা।'

'এটা আমি—নেবো ?'

সুমন্ত্র মুচকি হাসলো।—'ওটাতে এখন আর এসেন্স নেই।'

টুনকি ছোট্ট শিশিটা নাকের সঙ্গে চেপে ধ'রে বললো, 'এসেন্স না-ই বা থাকলো, গন্ধ আছে। আ—ঃ!'

সুমন্ত্র বাক্স বন্ধ ক'রে রাখতে-রাখতে বললো, 'যা এখন, ভাগ।'

দৌড়ে পালালো টুনকি, ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে।

সুমন্ত্র দরজাটা ভেজিয়ে দিলো, পকেট থেকে বের ক'রে ধরালো সিগারেট, চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়লো খাটে।

*

লুচি, বেগুনভাজা ও বাড়ির তৈরি দুটি রসগোল্লা সহযোগে সুমন্ত্র তার নীরব ও নিঃসঙ্গ চা-পান শেষ করলো। একটু পরেই দিয়ে গেলো খবর-কাগজ। ঢাকায় কাগজ আসে বিকেলে। এ-পত্রিকাটি তারই সঙ্গে এসেছে কলকাতা থেকে রেলে-স্টিমারে। একটু আগ্রহ নিয়েই সে কাগজ খুললো—সময় কাটবে। কিন্তু একটু চোখ বুলোতেই বুঝতে পারলো, কাল সকালে কলকাতায় যে-কাগজ প'ড়ে এসেছে, এ তারই একটু পরিবর্তিত সংস্করণ। তারিখটা শুধু আজকের।

কাগজ রেখে দিয়ে উঠলো সে, হাত-মুখ ধুলো বাথরুমে গিয়ে। জামা-কাপড় বদলে প্রসাধন শেষ করতে আরো কিছু সময় নিলো। তারপর এসে দাঁড়ালো বাইরের বারান্দায়। পাঁচটা বাজে, কিন্তু আকাশে এখনো ভরা আলো। কী চুপচাপ পথঘাট, কী চুপচাপ চারদিক। মাঝে-মাঝে পাখি ডাকছে দু-একটা। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাঁপছে তাদের আঙিনার পেয়ারাগাছের পাতাগুলো।

দুই ঢেউ, এক নদী

সুমন্ত্রর বড়ো ইচ্ছে করছিলো একটা সিগারেট খেতে—কিন্তু এক্ষুনি হয়তো মা এসে পড়বেন। মা আসবেন, বাবাও এসে পড়তে পারেন। তার চেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু বেরিয়ে কোথায়ই বা যাবে? রমনার মাঠে? একা-একা ঘুরবে? স্থানীয় বন্ধুদের মনে আনতে চেষ্টা করলো সে। গেলে হয় কারো বাড়ি। অশোক কেমন আছে না জানি।

মনে-মনে বোধহয় অশোকের কথাই সে ভাবছিলো, এমন সময় বাইরে একটা বাস্‌ থামলো, নামলো লঘু পায়ে একটি মেয়ে কুচকুচে কালো পাড়ের শাড়ি পরা, হাতে বই। বাড়ির দিকে আসতে-আসতে মাঝপথেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো, চেঁচিয়ে উঠলো—'দাদা!' তারপর দ্রুত পায়ে কাছে এসে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বললো, 'কখন এলে?'

'এই তো,' হাসলো সুমন্ত্র।

'বা! আমরা তো এদিকে তোমার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি শিলং চলেছো।'

সে-কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে সুমন্ত্র বললো, 'তোদের ছুটি হয়নি এখনো?'

'এই তো—হ'য়ে গেলো। আজই শেষ।'

'কী করবি ছুটিতে?'

'কী করবো? গড নোজ।'

দু-জনে গেলো ঘরের মধ্যে, সুমন্ত্রর ঘরে। টেবিলের উপর বই-খাতা রেখেই অরুণা চেঁচিয়ে উঠলো—'এই রে!'

'কী হ'লো?' জিগেস করলো সুমন্ত্র।

'বোলো না—পিণ্টুটার জ্বালায় আর পারি না—এমন দস্যি হয়েছে! এই কলেজে যাবার সময় তাড়াতাড়ি আমার পেন্সিল-

কাটা ছুরিটা এখানে রেখে গেলাম—নিয়ে ভেগেছে। কোথায় শ্রীমান ওরাং-ওটাং—কোন জম্বুবনে ব'সে ল্যাজ নাড়ছেন।'

সুমন্ত্র হেসে বললো, 'খুব তো কথা বলতে শিখেছিস, অরু।'

এই মন্তব্যে অরুণা একটু খুশি না-হ'য়ে পারলো না। আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'সকালবেলা হঠাৎ আমার একবার মনে হয়েছিলো যে আজ তুমি আসবে।'

'আমাদের সব মনে-হওয়াই যদি এ-রকম সার্থক হ'তো তাহ'লে আর কথা ছিলো না।'

অরুণা হঠাৎ একটু লাল হ'য়ে উঠলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো, 'মা, মা!' তারপর, সুমন্ত্রর দিকে ফিরে :

'বড়োদিনের ছুটিতে তুমি এলে না, তা-ই নিয়ে মা কত যে দুঃখ করেছেন। বাবাও কম যান না, কেবলই বলেন—ছেলেটা করে কী কলকাতায় ছুটিতে ব'সে!'

'আর কী বলেন বাবা?'

'বাবা কাজ ক'রেই সময় পান না—বেশি কথা বলবেন কখন? মা-ই তাঁকে জ্বালিয়ে খান। —ওগো, তোমার ছেলে নাকি নাচের দলে গিয়ে ভিড়েছে!' বিজয়ার কথার সুরের অবিকল নকল করলো অরুণা।

সুমন্ত্র হেসে উঠলো। সেই মুহূর্তে বিজয়া ঢুকলেন ঘরে, ভাই-বোনে চোখে-চোখে ইশারা ঝলসে গেলো। বিজয়া বললেন, 'এই যে অরু এসেছিস—টেবিলে তোর ভাত রেখে এসেছি, খেয়ে আয়।'

অরুণা কপাল কুঁচকে বললো, 'আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, মা।'

'এই এক কথা মেয়ের—ভাত খেতে ইচ্ছে করে না। এই তো কলেজ-ফেরতা খিদে—এখন ভাত না-খেলে চলে! যাবার সময়

কি আর খাওয়া হয় কিছু! যা—আড় মাছের ঝোল আছে, তখন তো খেয়ে যেতে পারিসনি—পেটির মাছ রেখেছি একখানা।'

অরুণা অগত্যা বললো, 'যাচ্ছি।'

'কলেজ-টলেজ ছুটি হ'লো, এবার খেয়ে-দেয়ে শরীর ভালো কর তোরা,' ব'লে বিজয়া চ'লে গেলেন। উপরের ঘরে কাপড়চোপড় ছড়ানো রয়েছে, আলনায় তুলতে হবে।

সুমন্ত্র আর অরুণা পরস্পারের দিকে একবার তাকালো; হাসি ঝিলিক দিলো দু-জনেরই চোখে।

অরুণা বললো, 'মা-র যেন মাথা-খারাপ হচ্ছে দিন-দিন। দিবারাত্র চরকি-বাজির মতো ঘুরছেন, আর খামকা যত কথা রোজ বলেন তা দিয়ে মোটা-মোটা তিন ভল্যুম ভ'রে ফেলা যায়।'

'এবার শরীর-টরীর ভালো কর আরকি, ঢাকায় তো দুধ-মাছের ছড়াছড়ি!' মুখ টিপে হাসলো সুমন্ত্র।

'ঐ এক কথা ওঁদের মুখে—শরীর। শরীর! দিব্যি সুস্থ দেহে প্রফুল্ল চিত্তে আছি—শরীর যা একটু খারাপ হয় তা ওঁদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর শুনেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সুমন্ত্র, 'মন্তুটা তো নাচের দলে ভিড়ে উচ্ছন্নেই গেলো!'

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো অরুণা।—'উঃ, কত সব কথা! ওয়াইল্ড!' তুমি নাকি দিনে-রাত্রে কখনো হস্টেলেই থাকো না, উদয়শঙ্করের হোটেলই নাকি তোমার ঠিকানা। আর, আর—' অরুণা হাসতে-হাসতে আঁচলে মুখ ঢাকলো।

'আর—কী?'

'একদিন নাকি মদ খেয়ে হস্টেলে ফিরেছিলে—'

মুহূর্তে লাল হ'য়ে উঠলো সুমন্ত্রর মুখ।—'কে বলেছে এ-সব কথা?'

'বলবে আবার কে? হাওয়ায় ভেসে আসে। বড়োদিনের সময় এসেছিলো জিতেনবাবুর ছেলে—তোমাদের কলেজে পড়ে বুঝি—'

'কে, বল তো?'

'প্রতাপ বুঝি নাম—'

'ও, প্রতাপ! ওকে আমরা scum বলি। গুজবরূপ নর্দমার উপরকার ময়লা ও। সেইজন্যেই বুঝি আয় বাছা ঢাকায় আয় ব'লে এত হাহাকার। ওঁরা বিশ্বাস করেছেন ও-সব কথা?'

'বাবা উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মা···কী জানি বাপু, কলকাতা জায়গা তো ভালো নয়,' অরুণার কথায় আবার বিজয়ার সুর লাগলো, 'মাসে-মাসে এতগুলো যে টাকা নেয় তা-ই বা করে কী?'

'এতগুলো!' নাক কুঁচকে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো। 'টাকা বেশি চাইলেই উপদেশের একটি মালগাড়ি পত্ররূপে এসে হাজির হবে, সে-ভয়ে বেশি টাকা চাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।'

'এ-সব কিছুই হ'তো না, ক্রিসমাসে একবার এলেই পারতে।'

'ক্রিসমাসে কলকাতাতেই সবাই আসে, কলকাতা ছেড়ে কেউ যায় না।'

'এ-ছুটিতেও আসবে না, লিখেছিলে।'

'আসবো না লিখিনি, পরে আসবো লিখেছিলাম।'

'গেলে না কেন শিলং?'

'শিলং গিয়ে কী হবে? ঢাকার মতো স্বাস্থ্যকর জায়গা কি আর জগতে আছে! তাছাড়া মাছ দুধ তরকারি—' সুমন্ত্র তার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা চেষ্টা ক'রেও চেপে রাখতে পারলো না।

অরুণা হেসে উঠলো।

'যা বলেছো!' তারপর হঠাৎ সুর বদলে বললো, 'খুব নাচ দেখলে, দাদা?'

'উদয়শঙ্কর তো ঢাকাতেও এসেছিলেন, দেখিসনি তোরা ?'

'তা দেখিনি ! তিনদিন দেখেছি। একদিন বাড়ি থেকে, একদিন কলেজ থেকে—'

'আর-একদিন ?'

'আর-একদিন—ও এমনি গিয়েছিলাম,' অরুণা একটু লাল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'উদয়শঙ্করের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?'

'দেখা হয়েছে দু-বার। কেমন লাগলো নাচ ?'

'ভালো লাগলো ; খুব, খুব ভালো লাগলো। কী সুন্দর দেখতে মানুষটা।'

'সুন্দর,' সুমন্ত্র সংক্ষেপে বললো।

'সেদিন আমরা বাড়ি-সুদ্ধু সব গিয়েছিলুম—'

'সব ?'

'বাবা বাদে। বাবা তাঁর মক্কেলদের নিয়েই আছেন, নাচ দেখবেন কী! কী যে ভালোবাসেন ঐ বাজে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে !! মা তো দেখে মুগ্ধ !'

'মুগ্ধ ! বলিস কী ?'

'তারপর যা মজার কথা বললেন ! তা মন্তু যদি এদের সঙ্গে একটু মিশেই থাকে, এমন কী দোষ করেছে !'

'ইশ—এত দয়া !'

'ও-রকম হয় মাঝে-মাঝে। যদি পারো ওঁদের সন্দেহভঞ্জন করতে, শিলং যাবার পাস্‌পোর্ট জুটে যেতেও পারে শেষ পর্যন্ত।'

'অত গরজ নেই আমার,' নিচু গলায় বললো সুমন্ত্র, দাঁতে-দাঁত চেপে।

পাশের ঘর থেকে এলো টুনকির গলা—'দিদি—খাবে এসো।'

'ঐ রে, ঘণ্টা বাজলো। আর-একটু দেরি করলেই তো মা এসে বকতে শুরু করবেন। খিদেও পেয়েছে, যা-ই বলো।'

'যা, খেয়ে আয়।'

অরুণা উঠে দাঁড়ালো।

'শোন,' সুমন্ত্র হঠাৎ বললো, 'অশোকের খবর রাখিস কোনো?'

সেই মুহূর্তে অরুণা ছিলো দরজার কাছে, এবং সুমন্ত্রর দিকে ছিলো তার পিঠ ফেরানো, এটা ভাগ্যের কথাই বলতে হবে। নয়তো তার মুখের চেহারা দেখে সুমন্ত্র ভাবতো কী? একটু চুপ ক'রে নিজেকে সামলে নিলো সে। মুখ না-ফিরিয়েই বললো, 'আছে এখানেই।'

'এখানে আছে তা তো জানি। আসে-টাসে?'

'আসে মাঝে-মাঝে,' অরুণা আধো মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরে নিজেই আবার বললো, 'তোমাকে চিঠিপত্র লেখে না?'

'কই, না তো!'

'তুমিও লেখো না বুঝি?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে সুমন্ত্র বললো, 'যাই, ওর খোঁজ ক'রে আসি একটু।'

অরুণা তখন ইচ্ছে করলেই বলতে পারতো—গিয়ে কী করবে, তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখানে আসবেন। কিন্তু অরুণা বললো না, বলতে পারলো না।

বারান্দা পার হ'য়ে যেতে-যেতে বিজয়া বললেন, 'অরু, এখনো তুই দাঁড়িয়ে আছিস! খেয়ে নে না বাপু, ভাতগুলো হিম হয়ে গেলো!'

'যাই মা, যাই।'

একা ঘরে, সুমন্ত্র দু-একবার পায়চারি করলো। বেলা প'ড়ে এসেছে, এই গ্রীষ্মের এমন যে লম্বা দিন, তাও ঢ'লে পড়ছে দীর্ঘায়িত ছায়ায়। এখনই হয়তো বাবা ফিরবেন কোর্ট থেকে, আবার তাঁর সঙ্গে লম্বা সম্ভাষণের ফিরিস্তি। সুমন্ত্র তার ছোট্ট আয়নার সামনে একটু দাঁড়ালো, চুলে চিরুনি চালিয়ে মস্ত সিল্কের রুমাল মুখে বুলোলো একবার, তারপর বেরিয়ে গেলো।

*

কিন্তু রাত্রে খাওয়ার সময়ের আগে বাবার সঙ্গে দেখা হ'লো না সুমন্ত্রর। হৃষীকেশবাবু সন্ধের পর কোর্ট থেকে ফিরলেন, সুমন্ত্র তখন বাইরে। সে যখন ফিরলো, হৃষীকেশবাবু তখন আপিশ-ঘরে মক্কেল-পরিবৃত। বাজলো দশটা, আইনের জাল থেকে তবু বেরোবার লক্ষণ নেই। সুমন্ত্র তার মাকে গিয়ে বললে, 'খাবো না, মা?'

'খাবি এখন? একটু দেরি কর না—বাবা এলে পরে একসঙ্গেই খাবি। ওঁর সঙ্গে তোর তো দেখাই হ'লো না এ-পর্যন্ত।'

'বড়ো ঘুম পেয়ে গেছে।'

'তা তো পাবেই—পথের কষ্ট কি কম! উপরের ছোটো ঘরে তোর বিছানা করেছি।'

'কেন?'

'ঘরটায় বেশ হাওয়া খেলে—আরামে শুবি। অরুণা শোবে বারান্দায়।'

'অত হাঙ্গামার কী দরকার? আমি নিচের ঘরেই শোবো।'

'আহা—নিচের ঘরে বড়ো সুখ! পিণ্টুকে ওখানে—'

'না, না, আমি নিচেই শোবো ব'লে দিলাম। আর কোথাও শোবো না।'

বিজয়া ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিছানা তো পাতা হ'য়ে গেছে।'

'আমি পিণ্টুর বিছানাতেই শোবো।'

বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, যা তোর খুশি।'

সুমন্ত্র উদাসীনভাবে একবার শিস দিয়ে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করলো। দেয়ালের কাছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, সেই ছবিটা দেখছি।'

সুমন্ত্র আর অশোক একসঙ্গে। সুমন্ত্রর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আগেকার শীতে তোলা। বসেছে দু-জনে দুটো হরিণের চামড়া-ঢাকা মোড়ায়। পায়ের নিচে ছড়ানো অনেক নুড়ি পাথর। অশোকের গায়ে সুমন্ত্রর লতা-আঁকা খদ্দরের চাদর: দু-জনের মধ্যে অশোক দেখতে ভালো, ফোটোগ্রাফারই বদ'লে দিয়েছিলো। গলা-খোলা পাঞ্জাবিতে সুমন্ত্রর তরুণ কণ্ঠ ভারি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। সবে দেখা দিয়েছে গোঁফের রেখা, দু-জনের মুখেই কৈশোর-সীমান্তের নিটোল নির্মলতা। সুমন্ত্রর মনে পড়লো সেই যে শীতের রোদ্দুরে তারা সাইকেলে চেপে গিয়েছিলো ছবিওলার দোকানে। কী ভালো লেগেছিলো!! কী ভালো লাগতো দু-জনের একসঙ্গে থাকতে। অশোক তখন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে। দু-জনে একসঙ্গে কবিতা পড়ে।'

'এ-ছবিটা—কোত্থেকে এলো?' মা-র দিকে ফিরে সুমন্ত্র জিগেস করলে।

'তোর বড়ো ট্রাঙ্কটায় ছিলো।'

'ও-ট্রাঙ্কে তুমি আমার হাত দিতে গেলে কেন ?'

'একদিন এমনি খুলেছিলাম—ঠিক উপরটাতেই ছিলো কাগজে জড়ানো।'

'তা আবার বাঁধিয়ে রেখেছো কেন ঘটা ক'রে ?'

'রেখেছি।' কথাটা নিতান্তই বাহুল্য।

সুমন্ত্র ছবির কাছ থেকে স'রে আসতে-আসতে বললে, 'এই ছবি বাঁধিয়ে রাখাটা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।'

'কেন, বাঁধিয়ে না-রাখলে ছবি থাকে নাকি ?'

সুমন্ত্র হঠাৎ রেগে উঠে বললে, 'থাকবে কেন ? কোন জিনিশটা থাকে ? মানুষ থাকে ?'

'কী যে বলিস ! ছবিটা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিলো, বাঁধিয়ে রেখেছি। হয়েছে কী তাতে ?'

'যত কাণ্ড তোমাদের—কোত্থেকে এক ছবি টেনে বের ক'রে ঘরের মধ্যে লটকেছো ! লোকে বলে কী ? তাও যদি ছবিটা ভালো হ'তো।'

'কেন, সুন্দর ছবি !'

'ঐ পদতলে শিলারাশি !' সুমন্ত্র হেসে উঠলো নিচু গলায়।

বিজয়া কথা বলতে-বলতে খাওয়ার টেবিল সাজাচ্ছিলেন, হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'গ্লাশগুলো সব হ'লো কী ? আস্ত এক ডজন গ্লাশ এলো এই তো সেদিন, তা আনতে সময় লাগে তো ভাঙতে লাগে না।'

সুমন্ত্র বললে, 'টেবিলের উপরেই তো অনেক গ্লাশ শোভা পাচ্ছে।'

'আটটা আছে—আর গুলোর যে কী গতি হ'লো—'

'তা এখন আর বেশি লাগবে কিসে ?'

'এখন লাগবে না ব'লেই যেখানে-সেখানে প'ড়ে থাকবে নাকি? এমনি ক'রেই তো যায়।'

'তা ভাঙবে না? কাচের গ্লাশ তো ভাঙারই জন্যে।'

'দু-দিন যাক, নিজের যখন কিনতে হবে তখন বুঝ্‌বি।'

'এখনই বুঝছি, তোমাকেও দিতে পারি বুঝিয়ে। শোনো: যদি গ্লাশ না-ই ভাঙে, লোকে আর নতুন গ্লাশ কিনবে না; আর নতুন গ্লাশ না-কিনলে ব্যবসা অচল হবে, আর ব্যবসা অচল হ'লে আজকালকার এই সভ্যতাই থমকে দাঁড়াবে। বুঝলে? সুতরাং গ্লাশ ভাঙাটা যে আমাদের কত বড়ো সামাজিক কর্তব্য—'

'নে, নে, আর ফাজলেমি করতে হবে না, থাম। এই চাকরগুলোর জ্বালায় আর পারিনে। পরের জিনিশ ব'লে একফোঁটা দয়ামায়া নেই। ঐ সুন্দর টী-সেটটাকে কানা করেছে সেদিন—'

'কোন টী-সেট?'

'বাঃ, ঐ যে তুই সেবার কলকাতা থেকে এনেছিলি—'

'ও—হ্যাঁ,' একটু লজ্জিত হ'লো সুমন্ত্র। ভেঙেছে বুঝি?'

'টী-পটের মুখটার কোণ ছুটিয়ে বিতিকিচ্ছিরি করেছে।'

'ও, ভাঙেনি!'

'ওকেই ভাঙা বলে। অত সুন্দর একটা সেট—একটুখানি খুঁত হ'লেই গেলো।'

'অমন এক-আধটু হওয়াই ভালো। আমার তো তা-ই ভালো লাগে।'

'তোদের ভালো-লাগা!' আর-কোনো মন্তব্য না-ক'রে বিজয়া ঢাকনা-পরানো চেয়ারগুলোকে পর-পর ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। সুমন্ত্র তারই একটাতে ব'সে পড়লো।

হাতে অনেক সময়, অথচ কিছুতেই মন নেই, এমনি তার মুখের ভাব।

'অশোকের এতক্ষণে আসা উচিত ছিলো,' সাইডবোর্ডের ভিতরটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বিজয়া বললেন।

'অশোক—আসবে নাকি আবার?'

'ওকে খেতে বলেছি।' ছেলের মুখে খুশির দীপ্তি দেখবার আশায় বিজয়া মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু সুমন্ত্র নেহাৎ সাধারণভাবে বললে :

'আমি গিয়েছিলুম ওর বাড়িতে।'

'ও তখন এখানে। তুই যদি সোজা চ'লে আসতিস তাহ'লেই দেখা হ'তো।'

'আমি একটু ঘুরে এলাম। তা ও খাবে তো আবার চ'লে গেলো কেন?'

'কী যেন কাজ আছে বললে।' একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়া বললেন, 'বেশ ছেলে অশোক। ভারি ভালো লাগে আমার ওকে।'

'আসে বুঝি প্রায়ই?'

'বাঃ, রোজই তো আসে। ওদের ইউনিভার্সিটির যত কিছু ব্যাপার হয়, নিয়ে যায় আমাদের। তুই যদি এখানে পড়তিস, বেশ হ'তো।'

'কেন বেশ হ'তো?'

'বেশ হ'তো আরকি। সেদিন ওদের থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলো —"ষোড়শী" করলে।"

'কে? অশোক সেজেছিলো নাকি ষোড়শী?'

'না, না, অশোক কেন—ছেলেরা সব করলে, বেশ হয়েছিলো।'

'তুমি আজকাল নানা জায়গায় যাচ্ছো বুঝি? নাচও দেখেছিলে, শুনলাম?'

'সে-ও অশোক! নয় তো আমার কি উপায় আছে এই ঘর-সংসার ফেলে কোথাও নড়বার?'

'কেন নেই? এই তো দিব্যি নাচে গেলে। থিয়েটারে গেলে।'

'যাই আরকি,' একটু লজ্জিতভাবে বিজয়া বললেন। 'তাই ব'লে কি যাবার কথা মনে হয় কোথাও? এই বুড়ো বয়েসে কি আর শখ থাকে কোনো?'

'মা! তুমি বুড়ো!' এতক্ষণকার উন্মন ভাব থেকে হঠাৎ চমকে উঠে সুমন্ত্র ধারালো গলায় বললে।

'বুড়ো না হই, হ'তে আর ক-দিন!'

'বুড়ো হ'তে খুব ভালো লাগে, না?' সুমন্ত্র প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো।

'আরে বোকা, মন্দ লাগলেই বা কী এসে যায়? বুড়ো যখন হবার তখন হবোই।'

'অনেক দেরি তার এখনো। আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, মা, কক্ষনো আর নিজেকে ও-রকম বুড়ো-বুড়ো বলবে না। বিশ্রী লাগে আমার। বি—শ্রী!'

বিজয়া মৃদু হাসলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু গুনগুনানির সুরে বললেন, 'তা বুড়ো কমই বা কী—এত বড়ো ছেলে যার—'

'নাও, নাও, তোমাদের এ-সব কথা মোটেও ভালো লাগে না আমার।'

যেন ছেলের ইচ্ছা অনুসারেই বিজয়া হঠাৎ অন্য কথা তুললেন:

'তুই কেমন রে, মন্তু, এবারেও লিখেছিলি ঢাকায় আসবি না!'

সুমন্ত্র মাকে সংশোধন করলে, 'আসবো না লিখিনি তো, পরে আসবো লিখেছিলাম।'

'শিলং যেতে চেয়েছিলি কেন ?'

সুমন্ত্র তীক্ষ্ণ চোখে মা-র দিকে তাকিয়ে বললে, 'কারণ নেই কিছু, এমনি। বেড়াতে।'

'এতদিন পর আমাদের একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না ?'

সুমন্ত্র চুপ।

আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বিজয়াও যেন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বলবার দরকার ছিলো না কথাটা, ব'লে ফেলে তাঁর নিজেরও কেমন লজ্জা করছিলো। কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে হালকা সুরে বললেন, 'ঢাকারও আস্তে-আস্তে উন্নতি হচ্ছে বেশ। নাচ, নাটক, গান-বাজনা—একটা-না-একটা হুজুগ লেগেই আছে। সুন্দর রেস্টোরেন্ট হয়েছে নবাবপুরে, পিণ্টুটা তো সেখানে গিয়ে আইস-ক্রীম খাবার জন্যে পাগল। বেশ লাইফ হচ্ছে আজকাল ঢাকায়।'

চেয়ারটায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সুমন্ত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

'ত্যাখো মা, আর যা-ই করো, আমার সামনে কোনো ইংরিজি কথা বলো না।'

বিজয়া চুপ ক'রে গেলেন। সুমন্ত্র একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর আস্তে-আস্তে হেঁটে এলো দরজা পর্যন্ত। একটু দাঁড়ালো সেখানে : বাইরে যাবে, না ঘুরে আবার ঘরের মধ্যেই আসবে সেটা ঠিক করতে পারছে না যেন। একটু পরে ঘরের দিকেই ফিরছে এমন সময় বাইরে বারান্দায় খুব মৃদু জুতোর শব্দ হ'লো, আর পর-মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকলো অশোক সেন।

অশোক ছেলেটি দেখতে বেশ। মানে, তার ঠিক সেই রকমের চেহারা যা দেখতে ভালো লাগে, এবং দেখলেই ভালো লাগে। আস্তে সে বলে, আস্তে চলে, তাকায় স্নিগ্ধ চোখে, হাসে মিষ্টি ক'রে। তাকে ভালো না-লাগা অসম্ভব, তাকে ভালোবাসা সহজ।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বন্ধুর সঙ্গে তার প্রায় ঠোকাঠুকি। অশোক হেসে বললে, 'এই তো সুমন্ত্র এসেছে, মাসিমা, আপনি কত ভাবছিলেন।'

বিজয়া একটা বাসনের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখছিলেন পুডিংটা ঠিক জমেছে কিনা। চোখ তুলে তাকালেন একবার, কিছু বললেন না।

সুমন্ত্র অশোকের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, 'তুমি দেখছি দিন-দিনই সুন্দর হচ্ছো, অশোক।'

মৃদুহাস্যে মন্তব্যটা স্বীকার ক'রে নিয়ে অশোক বললে, 'তুমি তো অনেক ফর্শা হয়েছো দেখছি।'

'গঙ্গার জল। তুমি এই এসে আবার কোথায় গিয়েছিলে?'

'খিদেটা জমিয়ে এলুম একটু হেঁটে। জঠরের আয়তন অল্প, মাসিমার রান্না বহুল।'

'হুঁ,' অকারণ গম্ভীর সুরে সুমন্ত্র বললো। 'চলো একটু ও-ঘরে গিয়ে বসি। পারিবারিক ভোজের ঘণ্টা বাজতে কিছু দেরি আছে এখনো।'

সেই ছোটো ঘরটিতে গিয়ে অশোক খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসলো। সুমন্ত্র বসলো বেতের চেয়ারটা মুখোমুখি টেনে নিয়ে, খাটের গায়ে জুতো-খোলা পায়ের চাপ দিয়ে। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের ক'রে বললে, 'খাও নাকি?'

অশোক এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝামাঝি-রকম একটু হাসলো।

সুমন্ত্র নিজে একটা সিগারেট নিয়ে বললে, 'খাও না বুঝি, উঁ?'

অশোক মুখচোরাভাবে বললে, 'একেবারে খাই না তা নয়। অভ্যেস নেই।'

'তুমিই ধন্য!' দীর্ঘশ্বাস ফেললে সুমন্ত্র। 'তারাই ধন্য, যারা মাঝে-মাঝে সিগারেট খায়, অভ্যেস করে না। সে-রকম যদি পারতুম তবে আর ভাবনা ছিলো কী আমার!'

'অভ্যেস করলে বড়ো খরচ।'

'যা বলেছো! তবে অভ্যেসটা করবার সময় খরচের কথা মনে থাকে না, আর খরচের ধাক্কা যখন লাগে তখন অভ্যেস হ'য়ে গেছে। যাক, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ নেই, জীবনটাই এমনি।' সুমন্ত্র প্যাকেটের তলার দিকটা ঠেলে বের ক'রে অশোকের দিকে বাড়িয়ে ধ'রে বললে, 'নেবে নাকি?'

অশোক একবার সিগারেটের দিকে, একবার দরজার দিকে তাকালো। তারপর বললে, 'না, থাক, এখন না।'

'নাও না!' একটু জোর দিয়ে বললে সুমন্ত্র।

'থাক, কেউ হয়তো এসে পড়বেন।'

'পড়লেনই বা।'

'পাগল! যদি মাসিমা আসেন—' ছবিটা যেন মনে-মনে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে অশোক ব'লে উঠলো, 'ছি!'

'কেন? ছি কেন? যদি খেতেই পারো, লোকের সামনে খেতে পারো না?' সুমন্ত্র সিগারেট ধরিয়ে বুক ভ'রে ধোঁয়া টেনে নিয়ে নাক দিয়ে আস্তে-আস্তে বের করতে লাগলো।

'তাই ব'লে মাসিমার সামনে!'

'তাই তো!' সুমন্ত্র হঠাৎ ব'লে উঠলো। 'তুমি আমার মাসতুতো ভাই, এ-খবরটা নতুন জানলুম।'

অশোকের ফর্শা কান টুকটুকে লাল হ'লো।—'ও একটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'

'কেন মাসিমা ডাকো? আমার মা কি তোমার মা-র বোন?'

'বা!' একটু আড়ষ্টভাবে জবাব দিলে অশোক। 'কিছু-একটা ডাকতে হয় তো।'

'কেন ডাকতে হয়? না-ডেকেও তো দিব্যি চলে, চলে না? আর মাসিমা ব'লে যে ডাকো, সত্যি-সত্যি কি মাসিমা মনে করো?'

কথাটা বিশেষ-কিছু নয়, কিন্তু অশোকের যেন খুব একটা ধাক্কা লাগলো। প্রথমে সে লাল হ'য়ে উঠলো, তারপর একটু ম্লান হ'য়ে নিচু করলো মুখ। একটু পরে বললে, 'অত মনে-করাকরির কী আছে, একটা কথা বই তো নয়। তুমিই বা এ নিয়ে এত বলছো কেন?'

সুমন্ত্র একটু চুপ ক'রে রইলো, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো ঠোঁট বেঁকিয়ে।

'তা তোমার মাসিমার তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা।'

কথাটা, কথাটার সুর অশোকের ভালো লাগলো না। বন্ধুর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। এ-রকম ক'রে কথা বলতে কোথায় শিখলো সুমন্ত্র? এ-রকম ও তো ছিলো না! এ যেন সবটা-না-বলা কথা, এ-কথা যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখা। অস্বস্তি বোধ হ'লো অশোকের।

সুমন্ত্র আবার বললে, 'এবং তোমার মাসিমার এই উচ্চ ধারণা থেকে যাতে স্খলিত না হও, সেদিকেও তোমার যথেষ্ট নজর।'

'কী যা-তা বলছো!'

'তবে সিগারেট খেলে না কেন ?'

'ধরো—ইচ্ছে করলো না ?'

'তা নয়। তুমি খেতে খুব ইচ্ছুক, কোনো নিরাপদ জায়গায় হ'লে তুমি নিশ্চয়ই খেতে। খেতে কিনা, বলো ?'

অশোক চুপ।

'অথচ এখন তুমি খেলে না, পাছে কেউ দেখে ফেলে! পাছে—আহা অশোক ভারি ভালো ছেলে—এ-কথাটায় কোনো চিড় ধরে।'

অশোক একটু ভেবে নিজের সমর্থন খুঁজে বের করলো :

'আমি সিগারেট খাই জানলে তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন। আর খামকা কারো মনে কষ্ট দিতে আমি চাই না।'

সুমন্ত্র হাসলো।

'নিজের স্বার্থের জন্য আমরা যা করি, অনেক সময়েই সেটাকে পরোপকার ব'লে চালিয়ে দিই। তারই নাম পলিটিক্স।'

'এমন সীরিয়স তুমি কবে থেকে হ'লে সুমন্ত্র ?'

'পাগল! আমি সীরিয়স! কিন্তু তুমিই বা এ-সব কপটতা শিখলে কবে ?'

কথাটা অশোকের বুকে লাগলো। সরল স্বভাবের জন্য চিরকাল সে বাহবা পেয়েছে। সত্যিও তার মনে কোনো মারপ্যাঁচ নেই। মারপ্যাঁচ সে জানেই না। সহজ সদ্ভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে তার মেলামেশা। শত্রু তার কেউ নেই, বন্ধুরা অনেকেই তাকে ভালোবাসে। 'কপটতা!' একটু আহত সুরে সে ব'লে উঠলো, 'এর মধ্যে কপটতা তুমি কোথায় দেখলে ?'

'তা নয় তো কী? তুমি সিগারেট খাও, কিন্তু সেই খবরটা রাখো লুকিয়ে, পাছে এঁদের কাছে তোমার সুনামের হানি হয়।

তার মানে, তুমি ঠকিয়ে সুনাম আদায় করছো। এটা কপটতা নয়? পীয়র হিপক্রিসি!'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, সুমন্ত্র, একটা তুচ্ছ জিনিশকে তুমি অকারণে ফেনিয়ে বাড়িয়ে তুলছো।'

'এটা কেন মনে করতে পারো না যে আমি সত্যি-সত্যি যা, সেই পরিচয়ই এঁদের দেবো—সিগারেট না-খাওয়ার উপরেই যে-ঠুনকো সুনামের নির্ভর তার লোভ না-হয় ছেড়েই দিলে। তার পরেও যদি এঁদের কাছে আদর পাও, তাহ'লে এটা অন্তত জানবে যে আদরটা খাঁটি।'

'এত যে বলছো, তুমি পারো এঁদের সকলের সামনে সিগারেট খেতে?'

'কেউ জানবে ব'লে ভয়ে মরি না। খাই যখন, লোকে তো জানবেই।'

অশোক জবাব দিলো না। সুমন্ত্র আবার বললে, 'তুমি যদি ভীরু না-হ'তে, তুমিও আমারই মতো ভাবতে। ছল-ছুতো ক'রে সুনাম কাড়তে লজ্জা করতো তোমার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, না-হয় আর সিগারেট খাবো না, তাহ'লেই তো সত্যি হবে, কপটতা আর হবে না।'

সুমন্ত্র অশোকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'সিগারেট খাবে না তাও রাজি, তবু সুনামের উচ্চ আসন থেকে ভ্রষ্ট হবে না! ধন্য ছেলে তুমি, অশোক; জীবনে তোমার উন্নতি হবে।'

অশোক লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি বললে, 'আহা—ভারি তো জিনিশ, খেলেই বা কী, না খেলেই বা কী!'

'তা-ই তো! যদি সে-কথাই মনে করো, তাহ'লে এত

ভয় পাও কেন ? আর সিগারেট খেলেই যাদের চোখে নেমে যেতে হয়, তাদের মতামতের উপর তো অবিমিশ্র অবজ্ঞাই থাকা উচিত।'

অশোক মুচকি হেসে কথাটা স্বীকার ক'রে নিলে।

'কী করবো, বলো ? সকলেই তো আর একরকম আবহাওয়ায় মানুষ হয় না।'

'কিন্তু মানুষমাত্রেরই র‍্যাশনাল হওয়া উচিত। ভেবে দেখবার, বোঝবার ক্ষমতা যাব নেই, সে আবার মানুষ কী !'

'ভেবে দেখতে, বুঝতে তুমিই কি পারো সব সময় ?'

'সব সময় পারি না, চেষ্টা করি। কুসংস্কার থেকে, সংস্কার থেকে, অভ্যাসের জড়তা থেকে মনটাকে মুক্ত ক'রেই দেখতে চেষ্টা করি সব জিনিশ। তা না-কবলে আমার আত্মসম্মান বজায় থাকতো না।'

'তুমিও তো একটা জিনিশকে ভালো বলো, আর-একটাকে বলো মন্দ। ভেবে ছাখো, সেটা তোমার ব্যক্তিগত রুচিরই কথা।'

একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললে সুমন্ত্র, 'রুচি এক কথা, আর সংস্কার আর। রুচি অনুভূতির ফল, আর সংস্কার জড়তার।'

অশোক কোনো জবাব দিলো না।

'আমাদের বুড়োদের ছাখো না,' সুমন্ত্র বলতে লাগলো', 'বয়সে বুড়ো নয়, মনে বুড়ো। সংস্কারের বস্তা এক-একটি। তারা যা বোঝে তার চেয়ে ভালো কেউ বোঝে না। তারা যেমন চায়, ঠিক সেই রকম সবাইকে করতে হবে। নিজের ইচ্ছেমতো এতটুকু কিছু করতে পারবে না তুমি ; তুমি কেমন ক'রে চুল ছাঁটবে, সেটা পর্যন্ত ব'লে দেবে তারা।'

এবারেও অশোক কিছু বললো না। এ-সব কথায় তার যেন

বেশি মন নেই, খানিকটা এমনি তার ভাব। সুমন্ত্র সেটা লক্ষ্য করলে, লক্ষ্য ক'রে বললে :

'থাক্, প্রথম দর্শনেই এক পশলা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলুম। এবারে আর-সব খবর বলো। কেমন আছো ?'

অশোক একটা মামুলিগোছের জবাব দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলো অরুণা। সঙ্গে-সঙ্গে অশোকের শিথিল ভাব দূর হ'য়ে গেলো, টান হ'য়ে বসলো সে, উজ্জ্বল হ'লো চোখ। আর সেই চোখ অরুণার চোখের উপর প'ড়েই স'রে এলো, আর অরুণা সুমন্ত্রর কাছে দাঁড়িয়ে বললে :

'খেতে চলো, দাদা, তোমরা।'

*

হৃষীকেশবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, যদিও মুখে এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি। ক্রমান্বয়ে কুড়ি বছরের আইনের পেশা তাঁর মুখে যে-ক'টা রেখা ফেলেছে, তার দোষ কাটিয়েছে মজবুত স্বাস্থ্যের জোর। শরীরটি তাঁর টনটনে। খাওয়াতে এখনো প্রচুর উৎসাহ ; খেতে পারেন, খেয়ে হজমেরও ত্রুটি হয় না। স্বভাবতই উচ্চস্বরে কথা বলেন তিনি, এবং যে-কোনোরকম ভাববৈলক্ষণ্যে—উৎসাহে কি মতদ্বৈধে কি ঈষৎ অসন্তোষে—সে-স্বর মাত্রা ছাড়িয়ে চ'ড়ে ওঠে। সেইজন্যে হঠাৎ তাঁকে বদমেজাজি ব'লে ভুল হয় ; কিন্তু যারা তাঁকে ভালো ক'রে জানে তারা তাঁকে সত্যিকার ভালোমানুষ ব'লেই জানে।

মক্কেল-মুক্ত হৃষীকেশবাবু জমকালো খিদে নিয়ে বসেছেন টেবিলের মাথায়, ডান দিকে তাঁর সুমন্ত্র, আর বাঁ দিকে অশোক, আর সুমন্ত্রর

পাশে অরুণা। প্রাথমিক ভোজ্য বস্তু টেবিলে আনা হচ্ছে, এমন সময় সুমন্ত্র হঠাৎ বললে, 'তুই আমার চেয়ারটায় আয়, অরু।'

হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন, 'কেন? কেন?'

'এখানটায় ভালো হাওয়া লাগে না।'

'হাওয়া লাগে না! আমি তো বেশ পাচ্ছি। পাখার ঠিক নিচে বসলেই তো হাওয়া পাবি না—বোস ওখানেই।'

সুমন্ত্র শুধু বললে, 'আয়, অরু, এখানে।'

জায়গা-বদল হ'লো। অরুণা আর অশোক মুখোমুখি; সুমন্ত্র পিতৃদেব থেকে অন্ততঃ একটা চেয়ার দূরে।

'কই, আনো না কী আছে তোমাদের,' হাঁক দিলেন হৃষীকেশ-বাবু।

'এই তো, এই তো,' ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বিজয়া। ভাত, বড়ো-বড়ো চাকতিতে ভাজা রুই আর রুইয়ের মাথার মুগের ডাল পরিবেশিত হ'লো।

সুমন্ত্র মাথা নিচু ক'রে আহারে মন দিতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'মা, তুমি বসবে না?'

'নে, নে, খা এখন,' বিজয়া অন্যমনস্কভাবে বললেন।

'তুমি বসবে না? তুমি খাবে না?'

বিজয়া কোনো উত্তর না-দিয়ে সুমন্ত্রর পাতে খানিকটা ঘি ঢেলে দিলেন।

'আঃ—আমাকে ঘি দিলে কেন? ঐ নাস্টি জিনিশগুলো কবে খাই আমি!'

'ঘি নাস্টি!' হৃষীকেশবাবুর নির্ঘোষ বেজে উঠলো। 'কে বললে এ-কথা? মূখ ছাড়া এ-কথা কে বলে!'

সুমন্ত্র নিঃশব্দে ভাতের বেড়া দিয়ে তরল সোনালি ঘিয়ের ছোটো

একটি দ্বীপ রচনা করলে। তারপর বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমিও বোসো না, মা। মহেন্দ্র বুঝি দিতে পারে না?'

'পাগল! মহেন্দ্র দিলে কারো পেটই ভরবে না।'

'নিজেই যদি সব করবে, এতগুলো লোকজন রেখেছো কেন? বোসো তুমি, একবারেই হ'য়ে যাক!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোকে। তুই খা।'

সুমন্ত্র আবার মাথা নিচু ক'রে খাওয়ায় মন দিলে। একটু পরে বললে, অনেকটা যেন আপন মনে, 'তা খাবে কেন! সবার শেষে একা-একা ব'সে চাকরদের মতো না-খেলে তো তোমাদের মান থাকে না!'

কথাটা হৃষীকেশবাবুর কানে পৌঁছলো, মাছের মুড়োর স্নিগ্ধ পদার্থগুলো আধ-বোজা চোখে ঘাড় কাৎ ক'রে শুষে নিয়ে সরস ও গাঢ় কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে খাওয়ানো—তার চেয়ে বড়ো সুখ স্ত্রীলোকের জীবনে আর কী আছে!'

ফশ ক'রে ব'লে উঠলো অরুণা, 'একটু ভুল বললে, বাবা। এখানে কন্যাও আছে একজন।'

মাছের মুড়োটাকে সোৎসাহে দাঁত দিয়ে আক্রমণ ক'রে হৃষীকেশবাবু বললেন, 'ওঃ, মেয়ে! মেয়ে আবার কে! মেয়ে তো পর!'

'পর!' অরুণা ব'লে উঠলো। 'আমি তোমার পর!'

মুড়োটাকে দাঁতের ফাঁকে নিষ্পেষণ ক'রে অরুণার পিতা বললেন, 'বিয়ে হ'লেই তো হ'য়ে গেলো!'

'হ'য়ে গেলো!' অরুণা তার বড়ো-বড়ো কালো চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো।

'ছাখ না তোর মাকে। তাঁরও তো মা-বাবা আছেন। কিন্তু কোথায় এখন মা-বাপ, আর কোথায় ভাই-বোন!'

অরুণা তার মাকে দেখলো।

'তুইও তোর স্বামী-পুত্রকে এমনি ক'রেই খাওয়াবি—'

হঠাৎ সেই সুগভীর ও সুউচ্চ স্বরের মাঝখানে শোনা গেলো সুমন্ত্রর ক্ষীণকণ্ঠ: '—আর এমনি ক'রেই তোর জীবন ধন্য হবে!'

'কী হে সুমন্ত্র, কথাটা পছন্দ হ'লো না বুঝি? এ-সব বুঝি তোমাদের মডার্ন শাস্ত্রে লেখে না?'

সুমন্ত্র নিঃশব্দে খেতে লাগলো।

'তোরা কী বুঝবি, এই তো সেদিন তোদের জন্ম হ'লো! বাপের বাড়িতে কি মেয়েদের কোনো সত্তা আছে নাকি? বিয়ে হ'লে তবে তাদের জীবন আরম্ভ।'

স্ত্রীলোকের জীবন সম্বন্ধে এত শুনেও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না-হ'য়ে অরুণা বললে, 'আর-একটা মাছভাজা আছে নাকি, মা—বড়ো ভালো হয়েছে।'

'নে, নে, আর মাছভাজা খেতে হবে না,' হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন। 'মেয়ের আবার অত খাওয়ার শখ কী? কত দেবে শাশুড়ি খেতে!'

বিজয়া মাছভাজার থালা নিয়ে এসে মেয়ের পাতে আর-একখানা দিতে যাচ্ছিলেন, হৃষীকেশবাবু হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন:

'তুমি খাবে না? চাকররা খাবে না! এদিকে তো আমার পাতে এক ঝুড়ি দিয়ে গেছো! এই নে।' নিজের পাত থেকে আস্ত একখানা ভাজা তুলে হৃষীকেশবাবু কন্যাকে দিলেন।

অরুণা মৃদুহাস্যে বললে, 'দিতে পারলে, বাবা, তোমার প্রাণে সইলো?'

হৃষীকেশবাবু প্রশস্ত হেসে বললেন, 'আমি খেতে ভালোবাসি ঠিক, এবং খাওয়ার সময় অন্য কারও কথা মনেও থাকে না—'

'মা-র কথা তো দিব্যি মনে থাকে দেখলাম,' বললে অরুণা।

বিজয়া সলজ্জভাবে বললেন, 'নে, আর ফাজলেমি করতে হবে না। তুমি আবার ওকে দিতে গেলে কেন—এখানে তো কত ছিলো।'

বলতে-বলতে তিনি স্বামীর পাতে আর-একখানা ভাজা ফেললেন।

'আহা-হা! করলে কী, করলে কী! তোমরা কেউ খাবে না? আর-কেউ খাবে না? আমিই সব খাবো নাকি?'

অরুণা বললে, 'ইশ্, খুব যে ভালোমানুষি, বাবা!'

হৃষীকেশবাবু অশোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে! আমার খাওয়া নিয়ে আমার মেয়ে পর্যন্ত ঠাট্টা করে আমাকে। তা মন্দ না, মন্দ না—খাওয়াটা জীবনের একটা প্রধান সুখ তা তো ঠিকই। আর স্ত্রীলোকের আবার একটা খাওয়া, তা—কী বলো? মেয়ে হ'য়ে যারা জন্মায়—'

সুমন্ত্র হঠাৎ চোখ তুলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছাখো বাবা, সমস্তক্ষণ ও-রকম মেয়ে-মেয়ে বোলো না, এ আমি তোমাকে ব'লে দিলাম।'

হৃষীকেশবাবু এক মুহূর্তের জন্য খেতে ভুলে গেলেন।

'তুমি আমাকে ব'লে দিলে! তুমি আমাকে ব'লে দেবার কে, সেটা শুনি?'

'বড়ো যে সব সময় মেয়ে-মেয়ে ব'লে নাক শিঁটকোচ্ছো, এই মেয়েরা না-থাকলে তোমার কী দশা হ'তো সেটা একবার ভেবে দেখেছো?'

হৃষীকেশবাবু সুমন্ত্রর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন হা-হা ক'রে।

'বেশ, বে—শ, বেশ! এখন আমাকে ছেলের কাছে শিখতে হবে! এই তো বেশ!'

শেষের কথাটা ঘরের দেয়ালে আছাড় খেয়ে সীলিঙে প্রতিধ্বনিত হলো।

হাসির ধাক্কা সামলে উঠে হৃষীকেশবাবু মুড়িঘণ্টে মনোনিবেশ করলেন। তারপর খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

হঠাৎ সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু বললেন: 'এই মন্তু, অত বড়ো-বড়ো চুল রেখেছিস কেন?'

সুমন্ত্র বললে: 'এই তো আসবার দিন ছেঁটে এলাম।'

'এ কী-রকম চুল-ছাঁটা তোদের। সমস্ত চুলই তো র'য়ে গেছে।'

মুহূর্তে সুমন্ত্র আর অশোকের মধ্যে চোখের বিদ্যুৎ ঝলসে গেলো। হৃষীকেশবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন:

'ঠিক আমাদের দেশের লেঠেল সর্দারদের মতো। সেই আমাদের কামাখ্যা বরকন্দাজ ছিলো—এমনি ঝাঁকড়া চুল—পাঁচ হাত লম্বা লাঠি নিয়ে কী তার লম্ফঝম্ফ!' অঙ্গভঙ্গি সহকারে বর্ণনাটা সেরে নিয়ে হৃষীকেশবাবু নিজেই হেসে উঠলেন। আর-কেউ হাসলো না। সুমন্ত্র একবার ঢোঁক গিললো, লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ।

'কাল সকালবেলা নাপিত আসবে, চুলগুলো একটু ভদ্রলোকের মতো ক'রে নিস।'

সুমন্ত্র একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বললে, 'মাথা কামিয়েও ফেলতে পারি, যদি বলো।'

'কোথায় শিখিস এ-সব আজগুবি ফ্যাশান! মাথা তো নয়, কাকের বাসা একটি। তাও বুঝি তেল দিসনে মাথায়?'

'তেল দিলে আমার মাথা ধরে।'

'তা তো ধরবেই। সব খাশ সায়েব এসেছিস কিনা বিলেত থেকে। বিলিতি ঢঙ করতে গিয়ে ঐ তো রোগা পটকা শরীর করেছিস। আর ছ্যাখ তো আমাদের স্বাস্থ্য—এই বয়সেও—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে অরুণা—'এই বয়সেও কী রকম খেতে পারি! সেটা আর মুখে বলতে হবে না, বাবা, উপস্থিত সেটা প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্ছে।'

'এ-বয়েসে তোদের বুঝি আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না! শিখেছিস কেবল অন্যের নকল করতে। আর শিখেছিস,' ছেলের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু জুড়ে দিলেন, 'কিছু বললেই প্যাঁচার মতো মুখ করতে।'

শেষের কথাটাতে যে-আপোশের ইঙ্গিত নিহিত ছিলো, সুমন্ত্রর উপর তা কোনোরকম কাজ করেছে এমন বোঝা গেলো না। সে রইলো মাথা নিচু ক'রে, মুখটা চাপা উত্তাপে জমাট।

বিজয়া যখন দ্বিতীয় প্রস্থ মাছ নিয়ে ছেলের কাছে এলেন, সুমন্ত্র বললে, 'আর খাবো না, মা!'

'আর খাবি না? সে কী! কিছুই তো খেলিনে!'

'রান্না সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহের সীমা না-থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ যা খেতে পারে তার তো একটা সীমা আছে।'

'কী খেলি? এরই মধ্যে পেট ভ'রে গেলো?'

'খুব ভরেছে, মা। খুব খেয়েছি। চমৎকার হয়েছিলো সব।' সত্যি—এতদিন হস্টেলের রান্নার পর যা-কিছু মুখে দিয়েছে সে, অমৃতের মতো লেগেছে।

'একখানা ইলিশ মাছ খা, সর্ষে দিয়ে রেঁধেছি।

'না, না, আর পারবো না।'

হৃষীকেশবাবু গলা-খাঁকারি দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'কোত্থেকে পারবে! দিন-রাত খালি চা! অত চা খেলে কি আর কারো খিদে থাকে!'

'তুমি আর বোকো না তো,' স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত ক'রে বিজয়া বললেন। 'তোমার জ্বালায় ছেলেটা ভালো ক'রে খেতেই পারলে না। আজই তো এসেছে—বাড়িতে পা দিয়েই এ-সব বাজে বকুনি শুনতে কার ভালো লাগে!'

'থাক, থাক, আর-কিছু বলবো না তোমার ছেলেকে। আমার অর্ধেকও ও খেতে পারে না, এটা দেখে দুঃখ হয়—মনে দুঃখ হয়।'

'যে যত বেশি খেতে পারে, সে-ই তো তত বড়ো মহৎ মানব,' মুখ টিপে হেসে বললে অরুণা। 'দাদা যখন খাবেন না, মাছগুলো সব বাবার পাতেই দাও মা।'

'খাবে না কী! খেতেই হবে ওকে। ওর মা নিজে গিয়ে রাঁধলেন, আর উনি এখন খাবেন না! গায়ে লাগে না, না?'

সুমন্ত্র আর প্রতিবাদ না-ক'রে একখানা মাছ গ্রহণ করলো। পিতৃদেবের সঙ্গে তর্ক করার চাইতে খেতে-খেতে ফেটে যাওয়াও বোধহয় ভালো: এমনি মনে হ'লো তার।

'হস্টেলে খেতে-টেতে দেয় কেমন?' জিগেস করলেন বিজয়া।

'কেমন আর।'

মন্তুর বুঝি ভালো ক'রে একদিনও পেট ভরে না, কেমন ক'রে উঠলো বিজয়ার বুক।

'ভালো লাগে ও-সব খেতে?'

'কী যেন। খেতে হয়, খেয়ে যাই।'

এতক্ষণে অশোক একটা কথা বললে: 'হস্টেলে থাকতে-থাকতে অভ্যেস হ'য়ে যায়। খাওয়া খারাপ, কিন্তু সে-কথা মনে থাকে না!'

'কত যেন কষ্ট হয় ছেলেগুলোর!'

'কেন, কষ্ট হবে কেন?' ব'লে উঠলো সুমন্ত্র।

অশোক বললে: 'হস্টেলের ছেলেরা বেশ ফুর্তি ক'রেই থাকে তো দেখি। আড্ডা, হৈ-চৈ, হুল্লোড়—'

'হ্যাঁ, ছেলেগুলো আড্ডা পেলেই সব ভুলে থাকে।' বিজয়া ঘুরে এসে অশোকের পিছনে দাঁড়ালেন। 'তোমাকে আর-একখানা মাছ দিই, অশোক?'

তাঁর কর্ণগোচর কোনো প্রসঙ্গের আলোচনা হ'তে থাকলে হৃষীকেশবাবুর পক্ষে তাতে যোগ না-দেয়া অসম্ভব। ইলিশের সর্ষে দিয়ে তিনি ভাত মাখলেন, তারপর:

'কষ্ট! হস্টেলের ছেলেদের কষ্টের কথা বলছো নাকি? আরে, তারা তো রাজার হালে থাকে। যে যা পারে আদায় ক'রে নেয় বাপের কাছ থেকে—তারপর মহা ফুর্তি! যা তারা চায় তা-ই পায়; যা তাদের খুশি তা-ই করে। কষ্ট ছিলো আমাদের সময়ে। ষোলো বছর বয়সে আমি ঢাকা কলেজে পড়তে আসি। কোথায় তখন রাজপ্রাসাদের মতো এই সব হস্টেল! লক্ষ্মীবাজারের এক মেসে আমার বাসা। এক ঘরে পাঁচজন ক'রে থাকি। মেসের খরচ মাসে তিন টাকা—'

এই কাহিনীতে অশোক একবার বাধা দিলে: 'তা তিন টাকা কম কী তখনকার দিনে।'

'ও-রকম ক'রে আজকালকার কোনো ছেলে থাকতেই পারবে না!' বাধা পেয়ে কথার স্রোতে আরো তোড় লাগলো।

'কী আমরা খেতাম? ডাল, ভাত, আলুসেদ্ধ—আর কলেজ থেকে ফিরে এক পয়সার বুটভাজা। কেরোসিনের একটা আলোয় তিন-জনে মাথা-ঠেশাঠেশি ক'রে পড়তাম—এক ঘণ্টার মধ্যে ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে যেতো চিমনি। এমনি ক'রে আমরা পড়াশুনো করেছি, এমনি ক'রে পাশ করেছি। মাসে আট টাকা খরচ সব সুদ্ধ।' এ-কাহিনী নিশ্চয়ই এত সংক্ষেপে শেষ হ'তো না, যদি না মেটাতে হ'তো ঔদরিক দাবি।

'আট টাকা?' অশোক মৃদু মন্তব্য করলে। 'কলেজের মাইনে?'

'তিন টাকা—'

'আর দু-টাকা দিয়ে কী করতে, বাবা?' সরল কৌতূহলে জিগেস করলে অরুণা।

'হাত-খরচ। খাতা-পেন্সিল থেকে ধোপা-নাপিত সব ওরই মধ্যে। পারতে তোমরা কেউ?' অশোকের দিকে তাকিয়ে সগর্ব ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন হৃষীকেশবাবু।

'পারতাম কি না-পারতাম সেটা নিরূপণ করবার উপায় নেই তো,' একটু হেসে অশোক বললে। 'অবস্থায় পড়লে সকলেই সব পারে।'

'না, না, এখনকার ছেলেদের সে-রকম গ্রিট্ই নেই। আরামের কাঙাল সব, বিলাসিতার দাস। কী যে হবে এদের দিয়ে আমি তো ভেবে পাই না।'

'বেশি ভেবো না, বাবা,' অরুণা বললে। 'টম্যাটোর চাটনিটা খাও।'

অশোক বললে: 'আজকাল দেশের অবস্থাই এমন হয়েছে যে একটু ভালোরকম থাকা-খাওয়া অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে।

কষ্ট করবার দরকারই হয় না আজকাল, এবং বাধ্য না-হ'লে কি কষ্ট করে কেউ!'

হৃষীকেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন: 'না, না, কষ্ট না-করলে কখনো মানুষ হয় না।'

অশোক খাওয়া শেষ ক'রে এক গেলাশ জল খেয়ে নিলে।

'বরং বলতে পারেন মানুষ হ'লেই তাকে কষ্ট পেতে হয়। থাকা-খাওয়ার কষ্টটাই তো মানুষের একমাত্র কষ্ট নয়। আর যাবতীয় কষ্টের মধ্যে সেটারই একেবারেই কোনো মহিমা নেই। মনুষ্যসমাজ থেকে সে-কষ্টের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই তো আজকের দিনের লক্ষ্য।'

অশোক তার কথাটা শেষ করতে পেরেছিলো নেহাৎই মনের জোরে। যে-মুহূর্তে তার প্রথম বাক্যটি শেষ হয়েছিলো, সেই মুহূর্ত থেকে হৃষীকেশবাবুর মুখে টগবগিয়ে উঠছিলো প্রতিবাদ। সেটা অগ্রাহ্য ক'রে বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিলো অশোকের।

'ও-সব বইয়ের বিদ্যে ছেড়ে দাও হে, অশোক,' ডান হাত আহারে ব্যাপৃত ব'লে মাত্র বাঁ হাতেরই একটা প্রবল ভঙ্গি ক'রে হৃষীকেশবাবু বললেন। 'বইয়ে-পড়া বিদ্যে কি আর জীবনে চলে!'

'জীবন নিয়েই তো সমস্ত বইয়ের কারবার।'

'না, না,' হৃষীকেশবাবু সশব্দে টম্যাটোর চাটনি চাখতে-চাখতে এ-বিষয়ে শেষ ও চরম কথা ঘোষণা করলেন। 'না, না, এ-যুগের ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না। কেবল আত্ম-সুখ, কেবল কষ্টের ভয়।...চাটনিটা আর-একটু দাও তো, বেশ হয়েছে।'

বাইরে, পরদার ফাঁক দিয়ে খাবার ঘরের আলোর একটা লম্বা হলদে তীর বারান্দাকে দু-ভাগ করেছে। তা ছাড়া অন্ধকার। অন্ধকার রাত ; কালো আকাশে তারাগুলো ঝকঝকে। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে থেকে-থেকে, থমকে-থমকে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে অশোক কী ভাবছিলো, টের পায়নি কখন অরুণা চুপি-চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই শোনো,' অরুণা ডাকলে, চুপি-চুপি।

অশোক চমকে মুখ ফিরে তাকালো। আবছা আলোয় ভালো ক'রে মুখ দেখা যায় না। ফিকে নীলের উপর শাদা ডোরা-কাটা অরুণার শাড়িটা কেমন অদ্ভুত ঠেকছে এই আবছা আলোয়।

খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললে না।

'পান খাবে ?' আস্তে একটু কাছে স'রে এলো অরুণা।

'দাও।'

অশোক হাত বাড়ালো। অরুণা তার মুঠো-করা হাতটা রাখলো অশোকের প্রশস্ত, প্রসারিত হাতের উপর। সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলো তার ক্লান্ত হাত।

'তুমি পান সেজেছো ?' পান মুখে দিয়ে অশোক জিগেস করলে।

'আগে বলো কেমন।'

'ভালো বলাটা নেহাৎ মামুলি হ'য়ে গেছে। অন্য কিছু বলতে ইচ্ছে করে।'

'অন্য কিছু !' অরুণা প্রতিধ্বনি করলে, আধো ঠাট্টার ঢঙে।

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ অরুণা কেমন মিনতির সুরে বললে, 'আমার বাবাকে ঐরকম মাথা-খারাপ মনে হয়—কিন্তু আসলে উনি খুব ভালো।'

'ও-কথা বলছো কেন?'

'অন্যকে কথা বলতে দেন না একেবারেই, এটা ওঁর মস্ত দোষ। আমারও রাগ হয় মাঝে-মাঝে।'

অশোক ক্ষীণ হাসলো, কিছু বললে না।

'কিন্তু ওঁর যত চোটপাট সব মুখেই, মনে ওঁর কিছু নেই।'

'তা আমি জানি।'

'তবু এক-এক সময় বড়ো বাড়াবাড়ি করেন। দাদা তো আজ রেগেই গেছে। তাতে কী—উপরে গিয়ে বাবা আবার পাকড়েছেন ওকে। বক্তৃতা চলছে।'

অশোক আবার হাসলো, এবার একটু শব্দ ক'রে।

'সেটা টের পাচ্ছি এখানে দাঁড়িয়েই। কানে আসছে গুমগুম আওয়াজ, কথাগুলো তলিয়ে যাচ্ছে। সেটা দুঃখের বিষয় বলতে পারি না।'

অরুণা হেসে উঠলো, খুব জোরে নয়।

'যত বয়স হচ্ছে এ-দোষটা বেড়েই চলেছে বাবার। ঠিক থাকেন এক মা-র কাছে।' একটু চুপ ক'রে থেকে অরুণা আবার বললে :

'আমার মা-ও খুব ভালো।'

'তাও আমি জানি।'

আবার একটু চুপচাপ।

খুব নিচু গলায় অরুণা বললে, 'অন্যদের সামনে একেবারেই কোনো কথা বলা যায় না। ভারি মুশকিল।'

'অন্যদের সঙ্গে কথা বলা যায়, সেটাই বাঁচোয়া।'

'কথা বলতেই নয়, নয়তো—'

'নয় তো ?'

'কে জানে কে কী মনে করবে !'

অশোক গম্ভীর হ'য়ে গেলো। ঘাড় ফেরালো অরুণার মুখ ভালো ক'রে দেখার জন্য। অরুণার গালের উপর একটি স্খলিত অলক এসে পড়েছিলো, সেইদিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো সে। একটু পরে বললে, 'কেউ কিছু মনে করে নাকি ?'

'এখনো করে না।'

'পরে হয়তো করবে ?'

'সেটাই ভেবে রাখা ভালো।'

অশোক বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর :

'তা তো ভেবে রেখেইছি। সমস্তটাই ভেবে রেখেছি।'

ধ্বক ক'রে উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা। এক দীর্ঘ মুহূর্ত দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে রইলো, পলক পড়ে না।

'এখন দাদা এলেন,' চোখ নামিয়ে অরুণা বললে।

'হ্যাঁ, সুমন্ত্র এসেছে। ভালোই তো।'

'দাদা তো বুঝতে পারবেন দু-দিনেই।'

'তা তো পারবেই।'

'না—না,' হঠাৎ অরুণা ব'লে উঠলো।

'কী ? কী—না ?'

'কেউ যেন বা বোঝে। কেউ যেন কিছু মনে না করে।'

'এ-খেলা যখন খেলছোই, সমস্তটাই মেনে নিতে হবে।'

'খেলা !' অরুণার মস্ত একটা নিশ্বাস পড়লো।

'সম্পূর্ণ রূপক অর্থে,' অশোক হাসলো। 'অত ভয় পেলে চলে ?'

'হয়তো এমন একটা কাণ্ড হবে—'

'তা তো হ'তেই পারে—শেষ পর্যন্ত।'

একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুব দ্রুত স্বরে বলতে লাগলো অরুণা, 'শোনো, তুমি না-হয় না এলে কিছুদিন। না—না, হঠাৎ না-আসাটাও চোখে পড়বে—চ'লে যাবে কোথাও কিছুদিনের জন্য? …পাগল! কী-সব যা-তা বলছি, কিছু মনে কোরো না।' নিজের কথার খেই হারিয়ে অরুণা ভাঙা-ভাঙা গলায় হেসে উঠলো।

'হঠাৎ তুমি এমন চমকালে কেন?'

'এসো আমরা খুব সহজ হই লোকের সামনে। খুব হাসিখুশি, খোলামেলা; খুব সাধারণ।'

'বরং এসো আমরা একদিন তুমুল ঝগড়া করি। তারপর থেকে কেউ কাউকে দেখতে পারবো না; আমার নাম শুনলেই তুমি কপাল কুঁচকোবে, তোমার কথা উঠলেই আমি করবো মুখ-ভার—বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠবেন আপোশের চেষ্টায়।'

অশোক আধো ঠোঁট খুলে একটু হাসলো।

অরুণার চোখেও হাসির ঝিলিক লাগলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে সে বললে, 'কী হয় জানো? এই তো দাদা এসেছেন, তাঁর সামনে তোমার দিকে তাকাতেই আমার ভয় করে; মনে হয় ধরা প'ড়ে যাবো।'

'গেলেই বা!'

'ভয় করে, ভয় করে আমার,' নিশ্বাসের স্বরে অরুণা বলে।

'কতবার তোমাকে বলেছি ভয় নেই। কোনো ভয় নেই,' অরুণার কানের কাছে মুখ নিয়ে অশোক বললে। পলকের জন্য লাগলো তার ঠোঁটে অরুণার কানের উপরকার চুলগুলোর রেশম-স্পর্শ। সঙ্গে-সঙ্গে অশোক স'রে গেলো, যেন ভয় পেয়ে।

'আমার এক-এক সময় মনে হয় কী, জানো?' একটু চুপ ক'রে

থেকে অরুণা বলতে লাগলো, 'মনে হয়, এই তো বেশ আছি আমরা, এই তো বেশ আছি! এখনো আড়াল আছে, এখনো আমরা আছি ছায়ায় লুকিয়ে। যে-মুহূর্তে ছায়া স'রে যাবে··· উঠবে ঝড়।'

'সইতে পারবে না?'

'এখনই কেমন ক'রে বলি? হয়তো পারবো।···কিন্তু না পারি যদি?'

অশোক জুতোর শব্দ না-ক'রে কয়েক পা হাঁটলো, তারপর ফিরে এলো অরুণার কাছে।

'একটা কথা। আমাকে ঠিক বিশ্বাস করো তো তুমি?'

'তোমাকে! বিশ্বাস করি!' অস্ফুট শব্দে হেসে উঠলো অরুণা।

'না, বলো। আজ সময় হয়েছে।'

অরুণা তার তরল কালো চোখে তাকিয়ে বললে, 'কী তুমি শুনতে চাও আমার কাছে?'

'বলো। আমাকে অভয় দাও, শক্তি দাও আমাকে।'

'আমি! আমি অভয় দেবো!'

'তুমি! তুমিই তো! তোমার মধ্যেই তো আমার শক্তির উৎস। তোমার অঙ্গীকারেই আমার নির্ভয়। এই যে দ্যাখো যুগে-যুগে দেশে-দেশে পুরুষের এত শক্তি, এত সাহস, তার মূল কোনখানে? কোন কালো চোখের অন্ধকারে?'

'অমন ক'রে বোলো না তুমি, অমন ক'রে বাড়িয়ো না আমাকে। যদি জানতে আমি কত ছোট, কত দুর্বল!'

'যদি জানতে তোমার ঐ ছোটো হাতে কত শক্তি! সে-কথা যাক। আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো কিনা বললে না তো।'

'সে-কথা জানতে চাও? তুমি বোঝো না?'

'তবু বলো। মুখ ফুটে বলো।'

অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধের মতো ব'লে উঠলো অরুণা, 'পারি, পারি।'

'আর আমাকেই কি তুমি চাও মনে-প্রাণে ?'

'চাই, তোমাকেই আমি চাই।'

'খুব বেশি ক'রে চাও ? সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক'রে ?'

'সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তোমার মতো আর-কিছুই চাই না।'

'সব ছাড়তে পারো আমার জন্য ? তোমার এই বাড়ি, তোমার ভাই, বোন, মা, বাবা ?'

'পারি ছাড়তে। এই বাড়ি, আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা-বাবা।'

'বলো. আরো বলো। বলো আমাকে : তোমার হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়তে পারি হতাশার রাজপথে. পথ হারাতে পারি দুঃখের অরণ্যে, তোমার সঙ্গে যেতে পারি মৃত্যুর সিংহদরজা পার হ'য়ে।'

'তুমি নাও আমাকে, আমাকে নিয়ে চলো যেখানে তোমার খুশি। তোমার সঙ্গে আমি বেরোবো হতাশার পথে, যাবো দুঃখের মুখে, পার হ'য়ে যাবো মৃত্যুর দুয়ার।'

হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপটা উঠলো, বাইরে গাছের পাতায়-পাতায় বাজলো দীর্ঘশ্বাস। শিউরে চমকে উঠলো দু-জনেই। যেন একটা ঘুম ভাঙলো, একটা মোহ গেলো কেটে। চোখে চোখ পড়তে দু-জনে হেসে উঠ্‌লো একসঙ্গে।

'কী-সব যা-তা বলছিলাম,' অরুণা বললে।

'আমাকে যেতে হবে এখন। অনেক রাত হ'লো,' বললে অশোক।

'ক'টা ?

অশোক অন্ধকারে তার হাত-ঘড়ির জ্বলজ্বলে কাঁটার দিকে তাকিয়ে বললে: 'দশটা—প্রায়। সুমন্ত্র কোথায় ?'

'এখনই নামবে উপর থেকে, এখানেই দাঁড়াও। বাবার হিতোপদেশের ঝড় শেষ হোক।'

'ঝড়টা একদিন তোমার দিকেও আসতে পারে,' অশোক হেসে বললে। 'প্রস্তুত থেকো।'

'আমার মা-বাবা খুব ভালো।' অরুণা কথাটা এমনভাবে বললে যেন তার নিজের ভিতরকার কোনো দ্বিধার খণ্ডন করছে।

'বার-বার বলছো কেন ও-কথা ? জানো তো, আমাদের জাতে মেলে না।'

বলা হ'লো কথাটা, যে-কথাটা এতক্ষণ ধ'রে প্রেতের মতো তাদের মাঝখানে, এতদিন ধ'রে। অশোক উচ্চারণ করলে তা: যেন এই অদৃশ্য প্রেতের ছায়া সে আর সইতে পারছে না, যেন সেটাকে কথায় স্পষ্ট মূর্তি দিয়েই সে ভূত ছাড়াতে চায়।

'আমাদের জাত আলাদা,' অশোক আবার বললে।

'তাতে কী ?' যেন খানিকটা জোর ক'রে অরুণা বললে। 'আজকাল তো এ-রকম কত হচ্ছে—'

'হচ্ছে তো।'

'তোমার মা-বাবা কেমন ?' হঠাৎ অরুণা জিগেস করলে।

'ওঃ, আমার জন্যে কিছু ভেবো না।'

'তাঁরা কি···তাঁরা কি আমাকে নেবেন না ?' কথাটা বলতে অরুণার গলা বুজে এলো।

'খারাপটাই ভেবে রাখা ভালো, আশাভঙ্গের কষ্ট তো হবে না।'

একটু ম্লান হ'য়ে গেলো অরুণা।

'অত ভাবছো কেন?' অশোক বললে। 'আমি কি যথেষ্ট নই?'

'আমিই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবো? তোমার অত লোকশান কি ভরবে আমাকে দিয়ে?'

কথাটা শুনে অশোক নিচু গলায় হেসে উঠলো।

'আমি কোনো আশা রাখি না, সুতরাং আমি নির্ভয়। যে-মস্ত জিতের আশা করছি সেটা যদি হয়, অন্য পক্ষে কতখানি লোকশান হ'লো তা হিশেব করবার ফাঁক থাকবে না। কিছু ভাঙচুর হবেই—সে তো জানা কথা।'

অরুণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে: 'কী সহজে বললে তুমি কথাটা।'

'তাছাড়া,' সাধারণ কথাবার্তার সুরে অশোক বললে, 'আমার পারিবারিক জীবন তো জানো।'

'মা প্রায়ই বলেন তোমার কথা—আহা, মা নেই।'

'আমার মা নেই! আমার যাতে মা থাকে সেজন্যে আমার বাবা তিন-তিন বার বিয়ে করলেন।'

'অমন ক'রে বোলো না তুমি। কষ্ট লাগে।'

'আমি তো এতে কিছু কষ্ট দেখতে পাই না।'

'জানি, জানি, সবই জানি তোমাব। কখন স্নান, কখন খাওয়া, কিছুরই কি ঠিক আছে! ঘুরে তো বেড়াও সারাদিন আড্ডা দিয়ে, রাত্রে কখনো বারোটায় ফিরলে, কখনো বা বন্ধুর সঙ্গে শুয়েই কাটিয়ে দিলে, জানি না তোমাকে!'

'এ-ই তো ভালো। এই রকম জীবনই তো ভালো।'

'কেউ কিছু বলে না তোমাকে?'

'কেউ কিছু বলে না। কী করিস, কোথায় থাকিস, ফিরতে

এত রাত হয় কেন, কিছু না। এটা যে কী চমৎকার লাগে বলতে পারি না। আর-কিছুর জন্য না হোক, এর জন্য বাবার কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

'কী যে বলো! তাহ'লে আর স্নেহ-মমতার অর্থ কী?'

'স্নেহ-মমতার অর্থ যে কী তা নিয়ে তোমার-আমার চেয়ে অনেক বড়ো-বড়ো মাথাওলা লোকেরা সম্প্রতি গবেষণা করছেন। আমি এটুকু বলতে পারি যে স্নেহ-মমতার পাওনাদার যদি এগারোটি সন্তান হয় তবে শেষ পর্যন্ত ইনসলভেন্সি নিতে হয়, তাছাড়া উপায় থাকে না।'

'অমন ক'রে কথা ব'লো কেন তুমি? ও-জিনিশগুলোর কি কিছু মূল্য নেই?'

'আমার পক্ষে যে নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছো। যে যার মন নিয়ে থাকুক, এ-ই তো আদর্শ অবস্থা। এর ব্যতিক্রমই অসহ্য!'

'তুমি যে-রকম বলছো, তোমার মা-বাবার সঙ্গে দিনে একবার হয়তো তোমার দেখাও হয় না?'

'কখন হবে? কেমন ক'রে হবে? মা-বাবা থাকেন দোতলায়, আমি থাকি একতলায়। কখনো-কখনো যেতে-আসতে বাবার সঙ্গে দেখা হয় বাড়ির সামনেকার রাস্তায়।'

স্তম্ভিত, ব্যথিত হ'য়ে অরুণা তাকিয়ে রইলো অশোকের মুখের দিকে। সে-দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে অশোক বললে:

'এত অবাক হচ্ছো কেন? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হ'লেই বা কী হবে? কী কথা বলবো আমি তাঁদের সঙ্গে? তাঁদের সঙ্গে আমার কোথায় মিল?'

'মা-বাবার সঙ্গে মিল নেই!'

'ও, হেরিডিটি! সে-মিল তো নাকের ছাঁদ বা মাথার টাক বা অমনি কতগুলো তুচ্ছ শারীরিক মুদ্রাদোষে আবদ্ধ। তার মানেই তো এ নয় যে মনের দিক থেকে কোনো সংযোগ আছে। যে-সংযোগটা খুব প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে আর্থিক। দুঃখের বিষয় বাবার কাছে এখনো মাঝে-মাঝে টাকা চাইতে হয়। সুখের বিষয় তিনি চাইলেই টাকা দেন।'

'তুমি তো টিউশনি করো, করো না!'

'করি। এই আর্থিক সংযোগটুকু একবার ছিঁড়তে পারলেই আর ভাবনা থাকে না।'

'ছী-ছি, যেন বাপে-ছেলেতে নেহাৎই টাকার সম্পর্ক!'

অশোক হেসে বললে, 'তুমি জানো না, এই টাকার সম্পর্কটা একবার ঘোচাতে পারলে পিতা-পুত্রে হয়তো একটা সত্যিকারের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তেও পারে।'

'তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝি না। শুনতেও ভালো লাগে না!'

'থাক তবে, আর না বললাম। আর সব-শেষের কথা হচ্ছে এই যে—'

কিন্তু কথাটা বলা হ'লো না। পিছনে শোনা গেলো সুমন্ত্রর স্যাণ্ডেলের ফটফট আওয়াজ। খুব সহজ সুরে অরুণা বললে, 'তাহ'লে সেই বইটা আনতে ভুলো না, অশোকদা।'

অশোক বললে: 'না, ভুলবো না।'

সুমন্ত্র অশোককে রাস্তায় একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে বললে: 'একটা কথা, অশোক। আমার বাবার সঙ্গে তুমি তর্ক করো কেন?'

'অভ্যাসের দোষ, বলতে পারো!'

'ভবিষ্যতে আর কোরো না। আমার বাবার সঙ্গে যে তর্ক করে সে হয় নির্বোধ, নয়...'

'...নয় ?'

'নয় সে আমার বাবার মতোই একজন। তর্ক তার সঙ্গেই চলে যার সঙ্গে মোটামুটি মেলে: যার সঙ্গে একেবারে কিছুই মেলে না, তার কথা চুপচাপ শুনে যেতে হয়—তারপর ভুলে যেতে হয়।'

সুমন্ত্র একটু ভেবে বললে, 'নয়তো কাজে অন্যরকম দেখিয়ে দিতে হয়।'

*

'আর সব-শেষের কথাটা হচ্ছে...'

কী ? মাথার নীচেয় হাত রেখে শুয়ে অরুণা চেষ্টা করলো ভাবতে। এত কথা বলা হ'লো, তবু কিছুই বলা হ'লো না। এত কথা বলা হয়: কিছুই বলা হয় না। কোন কথা তারা বলতে চেয়েছিলো, এত প্রশ্নে, এত উত্তরে, এত নিরুত্তরে ? কোন কথা তারা বলতে চায়, এত বলায়, এত না-বলায় ? সব কথার পর সব-শেষের কথাটা হচ্ছে...কী ?

পাশ ফিরে শুলো অরুণা। বড়ো গরম। ঘুম আসে না। এক-এক রাত্রে ঘুম আসতে চায় না, কী যেন হয়। জানে, কী হয়। খাটের গা ঘেঁষে তার ছোটো টেবিল, তার উপর টিকটিক করছে ছোটো চৌকো টাইমপিস। টিক-টিক, টিক-টিক। কটা বাজলো ? হয়তো দেড়টা, হয়তো মোটে বারোটা। তার মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধ'রে সে শুয়েছে, অনেকক্ষণ ধ'রে সে শুয়ে আছে...কিন্তু আলো

জ্বেলে ঘড়ি দেখলে হয়তো দেখবে আধ ঘণ্টাও হয়নি। তোমার সঙ্গে আমি যাবো হতাশার রাজপথে, দুঃখের মুখে, মৃত্যুর দরজায়। যাবো, যাবো আমি। যাবো তোমার সঙ্গে দুঃখের গুহায়, মৃত্যুর অরণ্যে। কথাগুলো কেমন অদ্ভুত, অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলে গুমরে ফিরছে বুকের মধ্যে। অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, যেন একটা অশরীরী অস্পষ্ট স্বর রাত্রির বুকের ভিতর থেকে উঠে এলো। সেই স্বরের স্পর্শে কাঁপছে অরুণার বুক। একটা স্বর···আর কিছু নয়। কোন রহস্যময় ধ্বনি : এই অন্ধকার তার প্রতিধ্বনিতে উল্কি-আঁকা। দুঃখের দরজায়, মৃত্যুর সিংহদ্বারে। অরুণার হৃৎস্পন্দনে তারই প্রতিধ্বনি।

হয়তো ভালোই হবে···শেষ পর্যন্ত···যদি সব ছাড়তে হয়। ছোটো একটি বাড়ি কোনোখানে—যেখানেই হোক। কী মানুষের দরকার? সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন মানুষের কোনটা? সবচেয়ে বড়ো ভয় নাকি খেতে না-পাওয়ার, সেই ভয় দেখানোটাই শাসনের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। কিন্তু কত আর খেতে পারে মানুষ, কত আর লাগে তার। আই. এ. পাশ করলে সে-ও পারবে একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিতে। ছোটো বাড়ি···সে রান্না করবে। হায় রে, সে তো এ-পর্যন্ত কোনোদিন রান্নাঘরে ঢোকেনি, কী দিয়ে কী হয় কিছুই জানে না। ওঃ, সব পারবে সে, সব পারবে : কী না পারে মানুষ, কী না পেরেছে, যখন তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন পূর্ণ হয়। ছোটো একটি বাড়ি, টবে দু-একটা চারাগাছ।

সেই অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো অরুণা, আবছায়া ঘরের দিকে তাকিয়ে। এ-ঘর তার। সকালবেলা ঐ টেবিলে সে পড়তে বসে, পুবের জানলা দিয়ে উঁকি দেয় ঝিলিমিলি রোদ। বিকেলে কতদিন জানলার ধারে ব'সে থাকে আনমনা হ'য়ে চুল বাঁধতে ভুলে যায়।

কোনো বন্ধু এলে এই ঘরেরই দরজা বন্ধ ক'রে কত প্রশ্ন, কত গোপন কথা। 'ওরে তোরা খাবি না?' ডাকতে-ডাকতে মা-র গলা ভেঙে যায়। রাত্রে এই খাটেই শোয়া—বালিশে যেই মাথা ছোঁওয়ানো, অমনি ঘুম। বন্ধুর কাছ থেকে ছু-দিনের কড়ারে উপন্যাস এনে তোড়জোড় ক'রে পড়তে শুরু করেছে শুয়ে-শুয়ে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মনেও নেই। মা এসে আলো নিবিয়ে গেছেন। মা-র কত খেয়াল। কখনো কিচ্ছু ভোলেন না। শোবার আগে রোজ একবার সবগুলো ঘর তাঁর দেখে যাওয়া চাই।

মাকে সে খুব ভালোবাসে। বাবাকেও। খুব, খুব। তাঁদের ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে এই বাড়ি, এই তার ঘর। এখানে কোনো অভাব নেই, এখানে সুখ, না-চাইতেই এখানে সব পাওয়া যায়। এখানে একান্ত নির্ভরের নির্ভাবনা। সব ছাড়তে হবে। যেতে হবে ছুঃখের পথে, হতাশার অরণ্যে। হয়তো: ছুঃখ, হতাশা, মৃত্যু। কী ঐ কথাগুলো, কী মানে ওই কথাগুলোর? ভাবতে বুক ভ'রে ওঠে। ঐ তো তার নিজের জীবন, তার নিজের জীবন নিজের হাতে সে নেবে। বাবা তো এই কথাই বলেন। তার মা-ও কি একদিন আসেননি, এমনি সব ছেড়ে, সব ভুলে গিয়ে? তারপর ছু-হাতে রচনা করেছেন নিজের জীবন। মা-রও তো মা-বাবা আছেন, তাঁরা এখন কোথায়? একবার দেখাও হয় না, একবার মনেও পড়ে না। তারও কি এমনি হবে? এরই জন্য কি মেয়েদের জন্ম?

টনটনিয়ে উঠলো অরুণার বুক। মনে পড়লো অশোকের পারিবারিক জীবন। ও বোঝে না, ও জানে না। দাদাও যেন কেমন। ছেলেরা কি অমনি হয়? ওদের কী, ওদের তো আর ছেড়ে যেতে হয় না। তাই ওরা অত সহজেই বলতে পারে—

চাই না ও-সব। অমন কথা কি মেয়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে কখনো! সে যে জানে একদিন তাকে ছাড়তেই হবে সব, অত মায়া তো তার সেইজন্যেই।

মেয়ে পর: বাবা তো খেতে ব'সেও একবার বললেন। বাবা প্রায়ই বলেন কথাটা। পর: কথাটা শুনতে কী বিশ্রী, ভাবতে কী নিষ্ঠুর। কিন্তু এ-কথাই বাপ-মা জানেন মনে-মনে; মেয়ে নিজেও কি আর মনে-মনে জানে না? যা-ই বলো না, আমি তো কেবল অমুকবাবুর মেয়ে নই, আমি আলাদা একটা মানুষ। আমি আমি। কথাটা ভাবতে অরুণার রোমাঞ্চ হ'লো। আছে আমার নিজের একটা জীবন, সেই জীবনের আছে পূর্ণতার আশা। তোমার সঙ্গে আমি যাবো দুঃখের পথে, হতাশার নির্জনতায়।

এমনি হয়েছে তার মা-র, তার মা-র মা-র, চিরকাল কত কোটি-কোটি মেয়ের জীবনে। এমনি হবে। সেই যে একটা মুহূর্তে এসে জন্মের সমস্ত গাঁটগুলোকে নির্মমভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া—শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা অন্ত্রতন্ত্র কি ব্যথায় ঝনঝন ক'রে বেজে ওঠে না? এ-কষ্ট ওরা কেমন ক'রে বুঝবে, ওদের তো ছাড়তে হয় না কিছু। তবু—মেয়ে যখন বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে চ'লে যায়, তখন কি কেউ কাঁদে, বলো, কেউ কি কাঁদে তখন? কাঁদে: কিন্তু সে-কান্না কি কেবলই দুঃখের আর বিচ্ছেদের, সে-কান্না কি নিস্পন্দ আনন্দেরও নয়, জ্যোতির্ময় মিলনেরও অশ্রু কি নয় সে?

মা-বাবা সম্প্রতি তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আভাসে ইঙ্গিতে টের পায় সে। চলছে লোকপরম্পরায় খোঁজাখুজি বলাবলি। ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না মনের মতো। এ কী বিশ্রী উপায় বিবাহের, হাজার কথা-কাটাকাটি, হাজার এটা-ওটা ছল কৌশল মিথ্যা কথা

ভান, যেমন ক'রে লোকে ব্যবসা করে। আর যে ছু-জন মানুষকে নিয়ে এত কাণ্ড, তারা লুডো খেলার গুটির মতো আঙুলের টোকায় চালিত হ'য়ে-হ'য়ে কোনোরকমে এসে পৌঁছয় বিবাহরূপ স্বর্গে। এ-প্রথা বাল্যবিবাহের, বাল্যবিবাহের এটাই উপায়। কিন্তু সাবালক পরিণত মানুষদের নিয়ে যখন কারবার তখন এটা শুধু যে অকেজো তা নয়, নিদারুণ অপমানের।

সে দিতে পারে বাঁচিয়ে তার মা-বাবার ছুর্ভাবনা, এত সব ঝকমারি। এগুলো তো সুখের নয়, এগুলো এড়াতে পারলে কে না খুশি হয়। সে নিতে পারে নির্বাচন ক'রে তার নিজের··· কথাটা অরুণা মনে-মনেও উচ্চারণ করতে পারলে না। মা-বাবা কি খুশি হবেন না? এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? ছু-হাত ভ'রে কি আশীর্বাদ করবেন না তাকে—তাদের ছু-জনকে? যে-ছু'জন মনে-মনে পরস্পরকে অঙ্গীকার করেছে তারা যখন মেলে, কত সহজ হয় সেটা, কত সুন্দর।

এত বোঝেন তার মা-বাবা, এটা বুঝবেন না? এত ভালোবাসেন তাকে তাঁরা, আর তার জীবনের সবচেয়ে গভীর প্রার্থনাকে কি ব্যর্থ হ'তে দেবেন? তা কি হ'তে পারে?

অরুণা চোখ বুজলো শক্ত ক'রে, চেপে-ধরা অন্ধকারে অসংখ্য লাল-নীল-বেগনি ফুটকি ফুটে উঠলো। অন্ধকারের মধ্যে এত রং আসে কোত্থেকে? থেকে-থেকে আবার বদলায়, যেন রঙের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে মেশামেশি, তারায়-তারায় কাটাকুটি। তা কি হ'তে পারে? তা কি হ'তে পারে? তা-ই যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে এই যে আমরা বলি মা-বাপের স্নেহ, তার মানে কী?

'স্নেহ-মমতার মানে নিয়ে তোমার আমার চেয়ে অনেক মাথাওলা বড়ো-বড়ো লোক সম্প্রতি গবেষণা করছেন। আমি এটুকু বলতে পারি···'

অশোকের স্বর বেজে উঠলো তার কানের কাছে, স্পষ্ট হ'য়ে। বাতাসে ভাসছে, সেই লঘু, শান্ত স্বর, তাতে ঈষৎ হাসির রেশ যেন লেগেই আছে। যেন ঘন কুয়াশা পার হ'য়ে এসে লাগছে, সুরটা ধরা পড়ছে, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। একটা স্বপ্নের মতো হ'য়ে উঠলো, যার মধ্যে আমি নিজে কথাগুলো তৈরি ক'রে অন্যের মুখে চাপাই। এই যে দীর্ঘ অস্পষ্ট মর্মর, এ তো অরুণারই মন থেকে উৎসারিত হচ্ছে, কিন্তু বেজে উঠছে অশোকের স্বরে; অশোককে কথা কওয়াচ্ছে অরুণা, তার নিজের কথা দিয়ে। বলো, বলো, কিছু বলো আমাকে; ঘুমের আগে আমাকে কিছু বলো।

*

পরের দিন রবিবার। রোজ তাড়াহুড়ো ক'রে খেতে হয় এগারোটার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে; আজ তার প্রতিশোধ। বহুল ও বিচিত্র ভোজ্যসংবলিত দীর্ঘ ভোজ শেষ হ'তে-হ'তে গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলাও হাঁপিয়ে উঠলো।

ভোজান্তে পরিপাটি বিছানা, ধবধবে চাদর, মোটা-মোটা তাকিয়ায় আরামের আমন্ত্রণ। শিয়রে রুপোর ডিবেয় পান, পাশে জরদার কৌটো।

তাকিয়ায় ঠেশান দিয়ে গোটা চার-পাঁচ পান একত্র ক'রে মুখে পুরে হৃষীকেশবাবু ডাকলেন, 'ওহে মন্তু!'

টুনকি বললে, 'দাদা নিচে।'

'এই না ওকে দেখলুম এখানে!'

'ডেকে আনবো?' কিছু কাজে লাগবার আশায় ছোটো টুনকির চোখ নেচে উঠলো।

'আন। সারাক্ষণ ঐ নিচের ঘরটায় করে কী ও! আন ডেকে, যা। অরু, অরু কোথায় গেলি?'

উচ্চকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হ'লো অন্য প্রান্তে অরুণার ঘরে। হাতের বই ফেলে ছুটে এলো অরুণা।

'কী? কী, বাবা?'

'তোর মাকে একটু ডাক তো, অরুণা।'

অন্য দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে বিজয়া বললেন, 'ব্যাপার কী? চেঁচিয়ে যে বাড়ি মাথায় ক'রে তুললে এই দুপুরবেলা।'

'কোথায় থাকো তোমরা সব? দুটো পান দাও।'

অরুণা হেসে বললে: 'তোমার ডিবেয় এখনো ভর্তি পান।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশবাবু হাসলেন।

'অরুণা, সেই তাস-জোড়া নিয়ে আয় তো।'

'তাস!' বিজয়া ব'লে উঠলেন। 'তাস দিয়ে কী হবে?'

'একটু খেলা যাক, এসো। আমি আর মন্তু। তুমি আর অরুণা। জেণ্টলমেন ভর্সাস লেডিজ।' হৃষীকেশবাবু হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।

'আমি এখন পারবো না বাপু ও-সব খেলতে,' বিজয়া আপত্তি করলেন। 'একটু শুয়ে বাঁচি!'

'পারবে না কী! পারতেই হবে। নাও, ওঠো, ব'সে যাও।' বালিশের স্তূপ সরিয়ে হৃষীকেশবাবু জায়গা ক'রে দিলেন।

'এসো না, মা, খেলি,' অরুণা সোৎসাহে বললে। 'বেশ হবে। অনেকদিন খেলি না।'

ছুটে গিয়ে তার টেবিলের দেরাজ থেকে সে তাস নিয়ে এলো। মাথা ঝেঁকে বললে:

'না, বাবা, আমি আর তুমি।'

প্রচণ্ড শব্দে তাস কেটে হৃষীকেশবাবু বললেন: 'সেটি হবার নয়। আচ্ছা, তাহ'লে আয় ব্রে খেলি, তোর মা-কে কেমন ব্রে ক'রে দিই ছাখ।'

'আহা—মাকে নিয়ে আবার খেলা! একবার ইস্কাবনের বিবি হাতে রেখে অন্য সব তাস ছেড়ে দিলেন, মনে নেই? তাস হাতে নিয়ে ব'সে বাজারের হিশেবের কথা ভাবলে কি খেলা হয়? তার চাইতে পিণ্টুকে নিয়ে বসাও ভালো।'

বিজয়া হেসে বললেনঃ 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো, পিণ্টুকেই ডাক। আমি বাঁচি তাহ'লে।'

'না, না, ও-সব চলবে না,' আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে উৎসাহে উচ্চকিত কণ্ঠে হৃষীকেশবাবু ঘোষণা করলেন। 'অতটুকু ছেলে আবার তাস খেলবে কী! নাও, এসো। কোথায়, সুমন্ত্রবাবু কোথায়?'

বলতে-বলতেই সুমন্ত্রর প্রবেশ। তার মুখে বিরক্তির ভাব, দিবা-নিদ্রার আয়োজনে ব্যাঘাত পেলে সকলেরই যেমন হয়। কাপড়টা তার দু-ভাঁজে লুঙ্গির মতো ক'রে পরা, গায়ে গেঞ্জি।

'এই যে এসো, ব'সে যাও, ঐ কোণটায় বোসো। চলুক তাস খানিকক্ষণ। কই, অরুণা, বসলি না এসে? ওগো, তুমি আবার কোথায় গেলে?'

হাঁক-ডাক শুনে বাইরের লোক মনে করতে পারতো কী যেন একখানা কাণ্ড। তারপর সুমন্ত্রর দিকেই আবার তাকিয়ে:

'এসো, এসো।—ও কী, ও-রকম অসভ্যের মতো কাপড় পরেছিস কেন?'

বিজয়া বললেন: 'পরেছে তো পরেছে। তুমি সবটা নিয়েই ও-রকম করো কেন বলো তো?'

'আহা—একটুখানি বলেছি তো কী হয়েছে। আমাদের চোখে যা ভালো লাগে না তা নিয়ে আমরা অমন একটু বলবোই। এসো, আরম্ভ করা যাক!'

সুমন্ত্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললে: 'আমি খেলবো না।'

'বাঃ!' হৃষীকেশবাবু গর্জন ক'রে উঠলেন। 'যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, এমন সময় তুমি একটি অশ্ব কিনা সব পণ্ড ক'রে দিলে। এসো, এসো—বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমার মা ব্রে হ'তে বেশি সময় নেন না, জানোই তো।' কথার শেষে হো-হো ক'রে তিনি হেসে উঠলেন।

সুমন্ত্র চুপ ক'রে রইলো।

সম্পূর্ণ তাসগুলো লম্বা চিকচিকে স্রোতে হাত থেকে বিছানায় ফেলতে-ফেলতে হৃষীকেশবাবু আবার বললেন: 'এসো, এসো। এদিকে দুটো প্রায় বাজলো। একটু ঘুমোতেও হবে তো রোববারে।'

সুমন্ত্র কথা বলার একটা ছুতো পেলো: 'আমার বড়ো ঘুম পেয়েছে।'

সে-কথা শুনতে না-পেয়ে, কি গ্রাহ্য না-ক'রে, হৃষীকেশবাবু তাসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন: 'এক গ্লাশ জল নিয়ে আয় তো, অরুণা। দেরি করিসনে, আরম্ভ হ'য়ে গেছে।'

সুমন্ত্র এবার নিজে থেকেই বললে: 'আমি খেলবো না।'

হৃষীকেশবাবু এমনভাবে সুমন্ত্রর দিকে তাকালেন যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

সুমন্ত্র আবার বললে: 'আমি খেলবো না, তাস খেলতে আমার ভালো লাগে না।'

হঠাৎ হৃষীকেশবাবু অদ্ভুত অনুনয়ের সুরে বললেন: 'আয় না মন্তু, একটু খেলি।'

সুমন্ত্র বললে : 'বুদ্ধিমান সাবালক মানুষ কী ক'রে তাস খেলে সময় কাটায় আমি ভাবতে পারি না।'

'দুঃখের বিষয় তুমি বুদ্ধিমানও নও, সাবালকও নও।'

সুমন্ত্র আর-কোনো কথা বললে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে কেমন বিশ্রী হ'য়ে গেলো যেন। একটু সময়, সকলেই চুপচাপ। তারপর হৃষীকেশবাবু তাসগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন লম্বা হ'য়ে।

'নে অরুণা, তাসগুলো তুলে রাখ।'

অরুণা জল আনতে গিয়েছিলো, ফিরে এসে ছাখে এই কাণ্ড।

'কী বাবা, হ'লো না খেলা?' তার স্বরেও নৈরাশ্য।

'নে, নে, বিরক্ত করিসনে এখন, ঘুমোতে দে।'

টুনকি ছিলো এই সমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী, এইবার সে এগিয়ে এলো।

'ঘুমোবে বাবা? তোমার পাকা চুল বেছে দিই?'

'পাকা চুল বললি যে? আমার চুল পেকেছে নাকি?'

'বা, সেদিনও তো তিরিশটা বের করলাম। দশটায় এক পয়সা দেবে বলেছিলে—'

'উঃ, এত!'

টুনকি হেসে বললে, 'দাওনি বাবা, এর আগেও দাওনি। তোমার কাছে সবসুদ্ধ আমি সাড়ে-পাঁচ পয়সা পাবো।'

'বাপরে, টনটনে হিশেব! ঐ বুঝি ডুগডুগি বাজিয়ে ভালুক-নাচ এলো। যা, ছুট!'

ছোটো-ছোটো পায়ে ছুটে নেমে গেলো টুনকি।

'অরুণা, শিয়রের ঐ জানলাটা ভেজিয়ে দে তো।'

জানলা ভেজিয়ে অরুণা চ'লে গেলো।

তারপর হৃষীকেশবাবু চোখ বুজে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। খাটের অন্য দিকে বিজয়াও কাৎ হয়েছেন একটু। তাঁর চোখ ঘুমে লেগে আসছে, এমন সময় হৃষীকেশবাবু হঠাৎ বললেন :

'মন্তুটার কী যেন হয়েছে।'

'উঁ ?' ধড়মড়িয়ে চোখ মেললেন বিজয়া।

'মন্তুর কথা বলছিলাম।'

'কী ?' ঘুমেল গলায় বিজয়া বললেন।

'মন্তুটা কেমন হয়েছে, দেখেছো ? সারাক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়েই আছে। আগে তো এমন ছিলো না কখনো।'

'তুমিই বা ওকে ও-রকম বলো কেন সব সময় ? ছেলে বড়ো হয়েছে সেটা মনে রেখো।'

হৃষীকেশবাবু হেসে উঠলেন :

'বড়ো ! বড়ো হয়েছে মন্তু !'

'আমি তো ওকে কত সমীহ ক'রে চলি আজকাল।'

'মাথা খাচ্ছো আরকি। পড়াশুনোয় এত ভালো হ'লো ও, কিন্তু স্বভাবের এই ট্যারচামি না-সারলে তো কিছুতেই হবে না।'

'একটা কথা বলি, শুনবে ?' ভীত, করুণ দৃষ্টিতে বিজয়া স্বামীর মুখে তাকালেন।

'তোমার আবার কী-কথা ?'

'তোমার ছেলের কথাই। তুমি ওর উপর কোনোরকম জবরদস্তি করতে যেয়ো না। এ-বয়সটায় ছেলেদের একটু হয়ই ও-রকম।'

'হয়ই, না ? এ-বয়সের ছেলের খবর আমার চেয়ে বেশী তুমি

জানো, না ? তিরিশ বছর আগে এ-বয়সের ছেলে কে ছিলো—তুমি ? না, আমি ?'

এই অকাট্য যুক্তিতে বিজয়া তখনকার মতো বোবা হ'য়ে গেলেন।

'আমরা তো কখনো এ-রকম ছিলুম না। কত কষ্ট করেছি ছেলেবেলায়—বাপ-মার যাতে সুখ হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য ছিলো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়া বললেন, খুব ভীরু স্বরে : 'সব মানুষ একরকম হয় না তো, সব কালও একরকম হয় না।'

হৃষীকেশবাবু অসহিষ্ণু স্বরে ব'লে উঠলেন : 'আরে এটা কি তোমার একটা কথা হ'লো ! যে-ছেলে বাপ-মার মুখের দিকে একবার তাকায় না, সে আবার ছেলে কী ! এখন তো দেখছি মেয়েই ভালো। অরুণা কি কখনো আমার সঙ্গে ও-রকম করবে ! মস্ত বড়ো হয়েছে, মূর্খ হয়নি, ভেবেছিলুম ওকে এবার সবই বলবো—দুঃখটা বুঝতে শিখুক—'

আঁৎকে ব'লে উঠলেন বিজয়া : 'না, না, অমন কাজও তুমি করতে যেয়ো না। ও ছেলেমানুষ, দুঃখ বুঝবে কী ক'রে ?'

'তুমিই না একটু আগে বললে ও বড়ো হয়েছে। আমাকে মনে রাখতেও বললে সেটা।'

লজিকের ত্রুটিতে কিছুমাত্র লজ্জিত না-হ'য়ে বিজয়া বললেন : 'আমরা তো ওর থেকে আসিনি, ও-ই এসেছে আমাদের থেকে। আমাদের দুঃখ ও বুঝবে কেমন ক'রে ?'

'বুঝবে না ?' হৃষীকেশবাবুর কণ্ঠ এক লাফে পঞ্চমে উঠলো। 'আমি বুঝিনি ? আমার বয়স যখন আঠারো—'

'থাক, থাক, আমাকে আর কী বোঝাবে ? আমি তো সবই জানি। যে যে-রকম ঘটনার চক্রে পড়ে, তেমনি তো হয়।'

'আজকালকার ছেলেদেরই এ-রকম ভাব দেখছি। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর!'

'আহা, এই ছোটো ব্যাপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন তুমি? কী করেছে মন্তু? তাস খেলেনি, এ-ই তো? না খেলেছে, বেশ করেছে। ভালো না-লাগলে খেলবে কেন? তা তোমার ছেলের নতুন গুণের কথা জানো তো—'

ব'লেই বিজয়া থমকে গেলেন। ভেবেছিলেন কথাটা স্বামীকে বলবেন না।' সকাল থেকে চেপে ছিলেন। কিন্তু স্বামীকে সকল কথা বলা তাঁর তিরিশ বছরের অভ্যেস, সহজ নয় সেটা কাটিয়ে ওঠা। এমন অনেক কথাই গোপন করবার চেষ্টা করেছেন, তিনি, শেষ পর্যন্ত পারেননি। দু-ঘণ্টা আগে কি পরে, দু-দিন পরে কি আগে ব'লে ফেলেছেন। এক অতর্কিত মুহূর্তে এ-কথাটাও বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে।

'কী? কিসের কথা বলছো?'

জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বিজয়া বললেন: 'আগে বলো রাগ করবে না? ওকে বলবে না কিচ্ছু?'

'দোষের হ'লে বলবো না এমন অন্যায় অনুরোধ তুমি করবে কেন?'

'দোষ মনে করলেই দোষ। ছেলেদের সব দেখি তো—ও-রকম দোষ আজকাল কোন ছেলেরই বা নেই!'

'কী হয়েছে তা-ই বলো না! কী করেছে মন্তু?'

ব্যাপারটাকে লঘু প্রমাণ করার চেষ্টায় খুব বেশি ক'রে হেসে বিজয়া বললেন: 'মন্তু সিগারেট খায়।'

'সিগারেট খায়!' সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন হৃষীকেশবাবু, ব'সে রইলেন বজ্রাহতের মতো। কিছুই বললেন না খানিকক্ষণ, বলতে

পারলেন না। হঠাৎ ফুটে উঠলো তাঁর চোখের সামনে মস্তর ষোলো বছরের চেহারা। সে এমন বেশিদিনের কথা নয়। সুন্দর সুগোল মুখে সরল উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি। পাৎলা লালচে ঠোঁট দুটিতে খুশির আভা লেগে আছে। সেই ঠোঁট আজ সিগারেট চেপে ধ'রে ধোঁয়া উগরোচ্ছে। তারপর সে-ছবি মিলিয়ে গেলো, এলো আট বছরের মন্তু, ঢোলা ইজের পরা, ছোট্ট শার্টের খোলা গলায় ধবধবে একটুখানি বুকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মস্ত মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ছোট্ট ঠোঁট দুটি কাঁপছে হাজার অকারণ অবান্তর প্রশ্নে। সেই ঠোঁটে আজ সিগারেট।

সেই ঘোরতর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে পরম মিনতির স্বরে বিজয়া বললেন : 'পায়ে পড়ি তোমার, ওকে কিচ্ছু বোলো না।'

'না, বলবো না,' হৃষীকেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ছেলে উচ্ছন্নে যাক, লম্পট মদ্যপ ব্যভিচারী হোক, আমি কিচ্ছু বলবো না।'

ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসলেন বিজয়া স্বামীর পায়ের কাছে।—'ছী-ছী-ছি, কী যে বলো! একটুও আটকালো না তোমার মুখে ও-কথাগুলো উচ্চারণ করতে!'

'আজ সিগারেট, কাল মদ, পরশু···এমনি ক'রেই তো অধঃপাতের পথে নামে মানুষ।'

বিজয়ার নিজের মনেও খটকা লেগেছিলো, কিন্তু স্বামীর এই বাড়াবাড়িতে নিজের কোনো কথা তিনি ব'লে উঠতেই পারলেন না। বরং ছেলের পক্ষ টেনেই বললেন : 'আহা—সবটাতেই তোমার সাপ-ঝলকি ভাব। সিগারেট খেলে কী হয়? কে না খায় আজকাল সিগারেট শুনি!'

'এইটুকু বয়সে!' গ'র্জে উঠলেন হৃষীকেশবাবু। 'ও কি কিছু বোঝে! এখন কি ওর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবার সময় হয়েছে!

স্বাস্থ্য নষ্ট, অর্থ নষ্ট—এখন বুঝতে পারছি কেন ওর এত টাকা লাগে। নেশা করলে কি আর টাকা চোখে দেখা যায়!' তারপর হঠাৎ গলা নিচু ক'রে বললেন :

'তুমি—দেখেছো?'

'আজ সকালে ওর বিছানা তুলতে গিয়ে দেখি, বালিশের নিচে সিগারেটের প্যাকেট।'

'তুমি কী করলে?'

'কী আর করবো—রেখে দিলাম সেখানেই।'

'ওকে কিছু বলোনি তুমি?'

'একবার ভেবেছিলাম বলি। তারপর বড়ো লজ্জা করলো।'

'লজ্জা করলো! ছেলেকে শাসন করতে লজ্জা করলো তোমার!'

এই তিরস্কারের কোনো জবাব না-দিয়ে বিজয়া খুব আস্তে বললেন :

'আচ্ছা, মন্তুকে এখানে পড়ালেও তো হ'তো। এখানকার ইউনিভার্সিটি মন্দ কী—অশোক তো পড়ছে।'

হৃষীকেশবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, যেন কথাটা শুনতে পাননি, কি বুঝতে পারেননি। তারপর :

'এখন আর সে-কথা ব'লে লাভ আছে কোনো? আমি তো তখনই বলেছিলাম—কাজ নেই কলকাতায় গিয়ে। না, ছেলে বেঁকে বসলেন, কলকাতায় পাঠাতেই হবে তাকে। এখানে কি কোনো কম্পিটিশন আছে! এখানে আই. সি. এস-এর কোনো স্কোপ নেই—কত ভালো-ভালো কথা শুনলাম তখন। তুমিও ছেলের হ'য়ে ওকালতি করলে—আহা, ওর মন ভেঙে দিয়ে লাভ কী। জবরদস্তি করলে পড়াশুনোতেই মন বসবে না। তা বসবে কেন, এখানে থাকলে আমরা দেখতে-শুনতে পাবো তো! অমন মহাস্বাধীন

হওয়া তো চলবে না। বাবু এখন কলকাতায় ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন আর ফাইন আর্টস-এর চর্চা করছেন! এখানে থাকলে খরচও কম হ'তো, তা বাবুর পোষাবে কেন? এই যে এতগুলো টাকা নেয় মাসে-মাসে, কী করে জানতে পারি? স্কলারশিপ আছে তার উপর। তবু নাকি বাবুর কুলোয় না, নালিশ লেগেই আছে। রটার! তুমিই তো ওকে নষ্ট করেছো ছেলেবেলা থেকে আহ্লাদ দিয়ে-দিয়ে!'

বিজয়া সপ্রতীক্ষ মুখে তাকিয়ে রইলেন। রাগের ঝড়টা যদি সুমন্ত্রকে ছেড়ে তাঁর উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, তাহ'লে তিনি বাঁচেন।

'টাকা নষ্ট করেছে, নিজে নষ্ট হচ্ছে। কোত্থেকে আসে টাকাগুলো তা একবার ভাবে ও? একবার ভাবে সে-কথা?'

'সে-কথা ভাববার বয়স তো নয় ওর।'

'না, বয়স নয়!' স্বামীর চীৎকারে অ-প্রস্তুত বিজয়ার বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে কেঁপে উঠলো। 'আমার কাছে ও-সব দরদ করতে এসো না, আঠারো বছর বয়সে একটা সংসার পড়েছিলো এই মাথার উপর।' হৃষীকেশবাবুর ডান হাত নাটকীয় ভঙ্গিতে উত্তোলিত হ'লো তাঁর মাথার উপর, তারপর দুম ক'রে তাকিয়ার বুকের মধ্যে অনেকখানি গর্ত ক'রে দিলে।

'আঃ, কী ক'রো! আস্তে কথা বলতে পারো না!'

'কেন, আস্তে বলবো কেন? ভয় করি নাকি কাউকে?' কিন্তু এ-কথাটাও হৃষীকেশবাবু বেশ গলা নামিয়েই বললেন।

'নাও, আর মাথা-গরম কোরো না, একটু ঘুমিয়ে নাও।'

হৃষীকেশবাবু শুয়ে পড়লেন বালিশে মাথা রেখে, চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক আস্তে বললেন, স্ত্রীর দিকে না-তাকিয়ে:

'প্র্যাকটিসের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে।'

বিজয়া চুপ।

'কয়েক ঘর বাঁধা মক্কেল আছে ব'লে টিঁকে আছি। কিন্তু এমনিতে যা অবস্থা। জীবন সরকারের অত বড়ো প্র্যাকটিশ ছিলো—ফেলে-ছড়িয়ে মাসে দেড় হাজার দু-হাজার হ'তো, এখন টেনে-টুনে আটশোও হয় না সব মাসে।'

'জীবন সরকার তো শুনি একটা মাতাল।'

'ঐ মদ্যপান ব্যাপারটা আইনের ব্যবসায় বেশ চলতি। পার্ট অব দি গ্রেট ট্র্যাডিশন, বলতে পারো। এক তোমার এই অযোগ্য স্বামীই ও-রসে বঞ্চিত রইলো।' হৃষীকেশবাবু হেসে উঠলেন। একটু পরে আবার বললেন, 'থাকগে, আমি কিছু ভাবি না। শরীরে যতদিন রক্ত আছে, আর সে-রক্তে জোর আছে ততদিন ভাবনা কী। স্বাস্থ্যটা পেয়েছিলাম—'

'আর বোকো না তো, এখন ঘুমোও।'

স্ত্রীর মুখ ভালো ক'রে দেখবার জন্য হৃষীকেশবাবু পাশ ফিরলেন :

'ভাবনা কী, কিচ্ছু ভাবনা নেই। কেবল উপস্থিত অরুণার বিয়েটা—'

'আহা—একসঙ্গে সব ভাবনা উথলে উঠলো কেন তোমার? হবে, সবই হবে। কোনো-কিছু তো ঠেকে থাকেনি কোনোদিন।'

'সেই যে পাত্রটির খোঁজ পাওয়া গেছে, না ফশকায়।'

'কে—কোনজন? বিজয়ার স্বরে স্পষ্ট উৎসাহের আভাস।

'আহা—তুমিও যেন দিল্লী থেকে এলে। সেই যে গাভার ঘোষ, বি. ঈ. ছেলে, টাটানগরে চাকরি করে—'

'ও, হ্যাঁ, আমিও এটার কথাই ভাবছিলাম। তা এটা যদি হ'য়ে যায় তো ভালোই। আর-কোনো খবর পেলে নাকি ওদের?'

'ছেলে নাকি শিগগিরই আসছে ছুটি নিয়ে। স্বয়ং মেয়ে দেখতে আসবে।'

'তা তো শুনছি। তারপর আর দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে মুরারিবাবুর?'

'তাঁর এজলাশে দেখা হয়, সেটা তো আর কথা বলবার জায়গা নয়। শিগগিরই এখান থেকে তাঁর বদলির কথা। তাঁরও ইচ্ছে তার আগেই—'

'বেশ তো, বেশ তো। তা তিনি একবার এসে অরুণাকে—'

'তিনি দেখবেন না,' ঠোঁট বেঁকিয়ে হৃষীকেশবাবু বললেন। 'ছেলে পছন্দ করলেই নাকি হ'লো। জজ মানুষ—একটু মেজাজও আছে।'

বিজয়া গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন, 'হুঁ। তা দাবি-দাওয়ার কথা কিছু হয়েছে নাকি?'

'সে-রকম কিছু হয়নি এখনো—তবে কিছু তো লাগবেই। সেই কথাই ভাবছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' বিজয়া হাসিমুখে বললেন, 'আগে সব ঠিক হোক তো, তারপর টাকার ব্যবস্থা হবেই একরকম।'

'আকাশ থেকে তো আর পড়বে না। রোজগার তো কম করিনি জীবনে, একটা পয়সা হাতে নেই। টাকা যা আসে, সঙ্গে-সঙ্গেই তলিয়ে যায়।'

'তা নিয়ে আপশোশ ক'রে তো লাভ নেই এখন। টাকা জমানো হচ্ছে এক-একজনের স্বভাব: যে পারে সে দশটাকাতেও পারে, যে পারে না সে হাজার টাকাতেও পারে না।'

'একটা ইনশিওরেন্সের টাকা সামনের বছর পাওনা হবে, তা থেকেই ধার করতে হবে, দেখছি।'

'না, না, ইনশিওরেন্সের টাকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, ঐ তো শেষ সম্বল।'

কথাটা হঠাৎ হৃষীকেশবাবুর মনে লাগলো। তাই তো, কেবল ছেলেমেয়েদের কথাই তিনি ভাবেন, স্ত্রীর কথা কখনো নয়। স্ত্রীর কথা আলাদা ক'রে ভাববার দরকার করে না, কিন্তু···ধরা যাক···আজ যদি তিনি হঠাৎ মারা যান? কোথায় দাঁড়াবে বিজয়া? একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই যে মাথা গুঁজবে। ছেলে? ছেলে বড়ো হোক, কৃতী হোক, এটা সব মা-বাপই চায়, কিন্তু ছেলেকে দিয়ে মুনফার আশা কে করে? তা ছাড়া, ছেলেকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। স্বামী না-থাকলে হিন্দু স্ত্রীলোকের কোনো ভরসাই নেই এ জগতে। ছেলে যদি করে, ভালো; কিন্তু না যদি করে? হৃষীকেশবাবুর মনে রীতিমতো কষ্ট হ'লো সন্তানকে মা থেকে এ-রকম বিচ্ছিন্ন ক'রে ভাবতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না-ভেবেই বা উপায় কী। শেষ পর্যন্ত, দুই জীবনের দুটো আলাদা স্রোত, দুটো আলাদা স্বার্থ। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কোনো দু-জন মানুষেরই সম্পূর্ণ এক স্বার্থ নয় জগতে। স্বামী যার জন্য কিছু রেখে না যায়, আশে-পাশে তার যতই থাকে, কেউ নিঃস্ব নয় তার মতো। ছেলেমেয়ের সুখের জন্য অবাধে অজস্র খরচ করবার সময় স্ত্রীর কথাটাও বোধহয় একবার ভাবা দরকার। ছেলে দাঁড়াবে নিজের পায়ে, মেয়ের বিয়ে হবে: স্ত্রীর আর-কেউ থাকবে না, আর-কিছু থাকবে না।

কথাটা এমন স্পষ্ট, এমন নির্মমভাবে হৃষীকেশবাবু আগে কখনো ভাবেননি। মনটা ভারি হ'য়ে উঠলো তাঁর।

'ইনশিওরেন্সের টাকাটা তাহ'লে থাক—সত্যি, তা-ই ভালো। মেয়ের বিয়ে যদি হবার হয় তো এমনি হবে।'

'দরকার হ'লে আনবে বইকি,' খুব সহজ সুরে বিজয়া বললেন। 'কিন্তু দরকার হবে না, দেখো।'

হঠাৎ একটি বাচ্চা-ঝড়ের মতো পিন্টু ঢুকলো ঘরে। পরনে শার্টের উপর খাকি হাফ-প্যান্ট, মুখ টকটকে লাল রোদে ঘুরে-ঘুরে। দম নেবার সময় না-নিয়ে বললে: 'মা, আট আনা পয়সা দাও তো শিগগির।'

'পয়সা! পয়সা দিয়ে কী করবি?'

'দাও শিগগির, দেরি কোরো না।'

'কোন রাজ্যি ঘুরে এলি রে দুষ্টু? এখন আবার কোথায় যাওয়ার মৎলব?'

'সিনেমায় যাবো—লরেল-হার্ডি। শিগগির—তিনটে বাজতে বেশি দেরি নেই।'

বিজয়া শক্ত হ'য়ে গিয়ে বললেন: 'রোজ-রোজ সিনেমা দেখার জন্য পয়সা দিতে পারি না। যা, ভাগ।'

'ইশ, রোজ বুঝি? সেই তো গেলো শনিবার গিয়েছিলাম—'

'আবার একমাস পরে যাবি। যা—কিছুতেই পয়সা পাবি না আজ।'

মা-র আঁচল ধ'রে টেনে পিন্টু বললে: 'দাও না, মা—আচ্ছা, আট আনা না-ই দিলে, চার আনা দাও। কোথায় তোমার চাবি? দাও, আমি খুলে নিচ্ছি।'

এক ঝটকায় আঁচলটা সরিয়ে নিয়ে বিজয়া বললেন: 'পালা শিগগির, বলছি। পাবি না আজ পয়সা, কিছুতেই না।'

পিন্টুর মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গেলো। অন্য দিকে তাকিয়ে বিজয়া বলতে লাগলেন: 'এ-ছেলেটাই কি কম পয়সা ওড়ায় নাকি! খালি সিনেমা আর সিনেমা—কী যে নেশায় পেয়েছে—'

'আহা, দিয়ে দাও না ওকে চার আনা,' ঘুমে প্রায় জড়িয়ে-আসা চোখ মেলে হঠাৎ হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন।

বিজয়া খাট থেকে নেমে হাত-বাক্স খুলতে-খুলতে বললেন: 'কে কাকে আহ্লাদ দিয়ে-দিয়ে নষ্ট করে সেটা মনে রেখো।'

পয়সা নিয়ে পিণ্টু লাফাতে-লাফাতে চ'লে গেলো।

'দি পাইন্স, শিলং
৭ মে

'প্রীতিভাজনেষু,

আপনি চিঠি লিখতে বলেছিলেন; দেখছেন তো, সে-কথা ভুলিনি। তবে এখানে এসেই যে লিখিনি তার অনেক কারণের মধ্যে এটাই প্রধান যে আমার মনে ক্ষুদ্র একটি আশা বাসা বেঁধেছিলো যে আপনিই হয়তো আগে লিখবেন। সে-আশার বাসা সম্প্রতি ভেঙেছে। (পারিবারিক বৃক্ষের আশ্রয়ে বন্ধুদের কি এমনি ক'রে ভুলতে হয়?) এখন এই শূন্য বাসায় আর-একটি আশার শাবক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে: এ-চিঠির উত্তর হয়তো ঠিক সময়ে পাবো। হোপ স্প্রিংস ইটার্নল ইত্যাদি।

জানেন, সেদিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার আশা ছিলো (আবার আশা! প্রমথ চৌধুরী হ'লে বলতেন এত আশাআশি দেখে হাসাহাসি ছাড়া উপায় থাকে না)—আশা ছিলো যে আপনি হয়তো আসবেন। দেখতে পাচ্ছিলুম আপনাকে, কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে দ্রুত পায়ে বিস্রস্ত দৃষ্টিতে প্ল্যাটফরম দিয়ে আসছেন, এদিকে ঘণ্টা বুঝি বাজে। এদিকে ঘণ্টা বাজলো, গাড়ি ছেড়ে

দিলো, আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই রইলুম, দমদম যখন এসে গেলো তখন খেয়াল হ'লো। বুঝতে পারলুম আপনি আর এলেন না, অগত্যা মার্ক টোয়েনের বই খুলে শুরু ক'রে দিলুম পড়তে। বড়ো মজার বই "ইনোসেণ্টস অ্যাব্রড"—পড়েছেন?

আচ্ছা, [illegible]-যাত্রা না-হয় না-ই করেছিলেন, সী-অফ করতে তো আসতে [illegible]ন স্টেশনে? ভাবখানা এই, যেন কতদিনের জন্য কত দূর দেশেই যাচ্ছি। তা দূর মন্দই বা কী; আর দেখা তো হবে আবার সেই কলেজ খুললে, কত দেরি তার। আপনি এলে আমি একাই খুশি হতাম না: বাবা খুশি হতেন, মা খুশি হতেন, টপসি খুশি হ'তো। টপসির কথা শুনে পাছে আপনার মানহানি হয়, সেইজন্যে ব'লে রাখছি যে টপসি যাকে-তাকে পছন্দ করে না; ওর ক্রিটিক্যাল ফ্যাকলটি আমাদের ইংরিজির প্রোফেসর ডক্টর ডাট-এর চেয়েও বেশি; ওর ভালো নজরে পড়া, আমি বলবো, রীতিমতো বিরল সৌভাগ্য।

তারপর—আপনি কেমন আছেন? ঢাকা জনপদটি কেমন? দেখবার সৌভাগ্য হয়নি কখনো। এই লম্বা দিনগুলো কী ক'রে কাটান? ডেসপারেট হ'য়ে ডক্টর ডাট-এর অনুমোদিত বইগুলোই পড়তে শুরু ক'রে দেননি, আশা করি? আমি তো ভেবে পাই না মানুষ কখন এত পড়ে, আর প'ড়েই বা কী সুখ পায়? সুখটা কি পড়বার? না, এত-এত বই পড়েছি সে-কথা ভাবতে পারার— লোককে জানাতে পারার?

আমার কথা যদি জানতে চান, এখানে এসে আমার ভালো লাগছে। আমি আর টপসি খুব বেড়াচ্ছি। আমি যদি রবীন্দ্রনাথ হতুম তাহ'লে অনেকগুলো পাতা প্রকৃতি-বর্ণনায় ভরিয়ে দিতে পারতুম: কিন্তু আমি এখানে বেশ আছি এবং আপনি কেমন আছেন

জানতে খুব উৎসুক, এ ছাড়া আর বিশেষ-কিছু বলবার মতো মনে পড়ছে না, যেহেতু আমি নিতান্তই আপনার অযোগ্য সহপাঠিনী—

মায়া।'

'—লারমিনি স্ট্রিট
পোঃ ওয়াড়ি, ঢাকা
১০ মে, রাত্রি

'সুচরিতাসু,

এই গরমে বৃষ্টির ছোটো পশলার মতো, আপনার চিঠি। পশলাটি বড়োই ছোটো, এই যা আপশোশ। লিখতে-লিখতে হঠাৎ অন্য কিছু মনে প'ড়ে গিয়ে উঠে গেলেন বুঝি? আমি এখানে এসে যা সুখে আছি, বলবার নয়। সকালে উঠে তা-না-না-না, তারপর খাওয়া, ঘুম; বিকেলে আর-এক প্রস্থ তা-না-না-না; রাত্রে খাওয়া, ঘুম। এ-হারে এগোতে থাকলে গোলগাল রসগোল্লার মতো চেহারা নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারবো, এই আশা আছে মনে। বই কতগুলো এনেছিলাম—আজকালকার পকেট-জ্ঞানসমুদ্র গোছের গোটাকয়েক ভল্যুম—সেগুলো বাক্স থেকেও বের করা হয়নি। জীবনের নানা রহস্যের, মানবসভ্যতার নানা বৈচিত্র্যের মর্মোদ্ঘাটন করতে সম্প্রতি আমি আদৌ প্রলুব্ধ হচ্ছি না; "নীলবসনা সুন্দরী" কি "দেবদাস"-"পরিণীতা" গোছের বই হাতের কাছে পেলে পড়া যেতো বরং। অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা নাকি একটি মহৎ গুণ। অন্তত, অবস্থার স্রোতে গা ঢেলে দেয়াটা যে সুখের, সেটা ঠিক। সম্প্রতি সেই সুখে আকণ্ঠ ডুবে আছি।

সেদিন আপনাকে সী-অফ করতে যাইনি—ইচ্ছে ক'রেই।

বুকের মধ্যে ঈর্ষার সবুজ সাপকে আরো খাদ্য দিয়ে মোটা ক'রে তুলে লাভ নেই। আমার সম্বন্ধে আপনি নিজস্ব ও পারিবারিক যে-শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। নিজের উপর শ্রদ্ধা হচ্ছে রীতিমতো। এখানে এসে ক্রমশই সংগ্রহ করছি যে আমাকে দিয়ে এ-জগতে কখনোই কিছু হবে না: এখন শুনলাম, এবারের ছুটিতে আমি শিলং পাহাড়ে গেলে তিনটি মানুষ ও একটি কুকুর খুশি হ'তো। এবং তিনটি মানুষ ও একটি কুকুরকে একযোগে খুশি করতে পারা এ-জগতে কম কৃতিত্ব নয়।

সকলকে দিয়ে সব হয় না: কথাটা অতি পুরোনো ও অতি সত্য। এমন মানুষও হয় যাকে দিয়ে কিছুই হবার নয়। যথা, আমি। আমি আই. সি. এস. হ'য়ে বাংলা উপন্যাস লিখবো না, পলিটিকাল মঞ্চ থেকে দেশবাসীকে 'বাণী' শোনাবো না, প্রতি সপ্তাহের আনকোরা বিলিতি বুলি চটকে মূর্তিমান কালচার হ'য়ে উঠবো না; এমনকি, বাবরি চুল আর ফর্শা রঙের জোরে সিনেমার অভিনেতা হ'য়ে এক পয়সার সাপ্তাহিকে ছবি ছাপিয়ে যে জীবন ধন্য করবো, এমন আশাও নেই। ঘুরবো আড্ডা থেকে আড্ডায়, খ্যাতনামাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখার চেষ্টা করবো, খ্যাতনামাদের ভালো-ভালো কথা নিজের ব'লে চালাবো অন্য জায়গায়, কেউ বোকা বলবে না, সবাই ভালোমানুষ ব'লে জানবে, কেউ বিশেষ আমলে আনবে না। ভেবে দেখতে গেলে, এ-রকম জীবন মন্দ নয় নেহাৎ। আপনি কী বলেন?

অবশ্য আপনার কথা আলাদা, সব দিক থেকেই আলাদা। আমাকে আপনার বন্ধুতা দান ক'রে আপনি আমার প্রতি দয়াই প্রকাশ করেছেন। আপনার বাড়িতে যাঁদের আনাগোনা, তাঁদের সঙ্গে নিজেকে একবার তুলনা করলেই সেটা বুঝতে পারি। কৃতী

হবার জন্যই তাঁদের জন্ম। আমি যদি বেঙ্কটরমণের মতো টেনিস খেলতে পারতুম, তাহ'লেও আপনার এ-করুণা সার্থক হ'তো। আমি অবশ্য নিজেকে এই ব'লে প্রবোধ দিই যে কোনো-কোনো অবস্থায় টেনিস-খেলোয়াড় হবার চাইতে দর্শক হওয়াই ভালো: কেননা আপনি যখন টেনিস খেলেন তখন কী সুন্দর যে আপনাকে দেখায় সেটা খেলোয়াড়দের চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে না। তারা খেলা দেখে, আমি আপনাকে দেখি।

আর লিখতে পারছি না। পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ও অর্থ প্রার্থনা ক'রে পিতৃদেবকে চিঠি ছাড়া জীবনে কিছু লিখেছি ব'লে মনে পড়ে না। এক দৌড়ে এতটা লিখে হাঁপিয়ে পড়েছি। তাছাড়া ঘুমও পেয়েছে।

সুমন্ত্র'

দি পাইন্স, শিলং
১৫ মে

বিনয়াবতারেষু,

ইচ্ছে করলেই আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিনয় করতে পারতুম, কিন্তু আজ কী হয়েছে তা আগে শুনুন। কয়েকদিন যাবৎই একটা বেড়াল ঘুরঘুর করছে আমাদের বাড়িতে—কী বলবো, ঠিক পেত্নির মতো দেখতে। এমনিতেই আমি দু চক্ষে বেড়াল দেখতে পারি না; তার উপর একেবারে ঠিক যদি পেত্নির মতো দেখতে হয়, কেমন লাগে বলুন তো? আমি ভুবনকে বলি মারো, বীর বাহাদুরকে বলি কাটো, আলতাফকে বলি পাকড়ো, তা ঐ উৎপাত দূর হয় না কিছুতেই। আজ হয়েছে কী, আমরা

খেতে বসবো, দেখি, কখন থেকে শ্রীমতী গুটিশুটি হ'য়ে ব'সে আছেন টেবিলের তলায়। রাগে শরীরটা জ্ব'লে গেলো। ডাকলুম, টপসি! টপসি ছুটে এলো তাড়া ক'রে, কিন্তু কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে শুরু করলো চীৎকার। ভাবতে পারেন, বেড়ালটার এতটুকু গ্রাহ্য নেই, পিঠ ফুলিয়ে চুপচাপ ব'সে চোখ মিটমিট করতে লাগলো। আমি বললুম, টপসি, তুই একটা আস্ত কাওয়ার্ড। অত বড়ো শরীরটা নিয়ে অতটুকু বেড়ালের কাছে যেতে পারিসনে? ধিক তোকে। এই না ব'লে দিলুম ওকে ঠেলে টেবিলের তলায়। তারপর একটা ফোঁ—ও—শ্‌শ্‌শ্‌, সঙ্গে-সঙ্গে টপসির তীব্র চীৎকার ও তারপর বেড়ালরূপী পেত্নির দে ছুট। আমি বললুম: কেমন, এইবার কেমন, আর আসবি! ব'লে টপসিকে একটু আদর করতে গিয়ে দেখি—ও মা! রক্ত এলো কোত্থেকে? টপসি মাথা নিচু ক'রে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর তার কান বেয়ে রক্ত পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা। দস্যি ডাইনি রাক্ষুসি বেড়াল। যাদের নখ চামড়ার ভিতরে ঢাকা, কক্ষনো যেন তাদের কেউ বিশ্বাস না করে।

তারপর খেয়ে-দেয়ে বাবার মোটা লাঠিটা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে এলুম, কোথাও দেখা পেলুম না রাক্ষুসিটার। তারপর এই তো আপনাকে চিঠি লিখতে বসেছি—মোটা লাঠিটা হাতের কাছেই আছে। আবার আসুক না, আস্ত রাখবো না ওকে। টপসি এখন ভালোই আছে—আমার পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেচারা! ঐ পুঁচকে বেড়াল কিনা একটা খাশ টেরিয়রকে দিব্যি মেরে গেলো। তা কুকুর ও-রকম মারতে পারবেই বা কেন, কুকুর তো ছোটোলোক নয়।

সম্প্রতি রাস্তায় একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হচ্ছে,

তার নাম ন্যান্সি। আয়া তাকে ঠেলে নিয়ে যায় পেরাম্বুলেটরে, আর সে ব'সে থাকে আপেলের মতো টুকটুকে গাল আর নীলচে জোলো-জোলো চোখ নিয়ে বোধিসত্ত্বের মতো গম্ভীর মুখ ক'রে। তাকে যদি জিগেস করি, তোমার নাম কী? সে বলে নান্‌থি। যদি বলি, তোমার বাড়ি কতদূর? সে বলে নান্‌থি। আর যদি, তোমার মা কোথায়? তাহ'লেও সে বলে নান্‌থি। প্রায় হ-য-ব-র-ল-র তকাইয়ের মতো। ভারি মজা।

১৬ মে

কাল আর-একবার বেড়ালটার খোঁজ করতে উঠে গেয়েছিলুম, চিঠি শেষ করা হয়নি। রাক্কুসিটা আজ আবার এসেছিলো, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো রান্নাঘরের কাছে, বীর বাহাদুর আর আলতাফ দু-জনে মিলে খুব মেরেছে ওকে। খুব মানে অবিশ্যি কিছুই নয়, দু-এক ঘা পড়তে-না-পড়তেই চার পা তুলে চম্পট। অসভ্য জানোয়ার! কাল কুকুরটার রক্ত বের ক'রে দিলি, আজ না-হয় ধীরে-সুস্থে একটু মারই খা।

আপনার চিঠি দু-বার তিনবার পড়েছি। ঐটুকু লিখেই ঘুম পেয়ে গেলো? নিজের অকর্মণ্যতার হাতে-হাতে প্রমাণ দিলেন বুঝি? নিজেকে এ-রকম ওয়ার্থলেস ব'লে ভাবতে লাগে মন্দ না—দিব্যি রোমান্টিক। আমিও মাঝে-মাঝে ও-রকম ক'রে ভাবি। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারি না, নিজেরই হাসি পেয়ে যায়। কিছু করতেই হবে নাকি? কিছু হ'তেই হবে নাকি? আমি আছি তো আছি। আপনি আছেন তো আছেন। আবার কী? এই যে টপসি এত চ্যাঁচাচ্ছে, এত লাফাচ্ছে, আর এত খেলছে এত শুঁকছে এত ধুঁকছে—ও কী করছে? কিছুই করছে না, কিন্তু

সবই করছে। ওকে তো করতে হয় না কিছুই: ও যে আছে, এটাই খুব চমৎকার।'

কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমার শখ ছিলো এরোপ্লেন চালাতে শিখবো। সে-শখ যে এখন আর নেই তাতেই প্রমাণ হয় যে ইচ্ছেটা খাঁটি নয়। এখন দেখছি ও-সব বৃহৎ কাণ্ডকারখানার কিছুই দরকার করে না—জীবনটা এমনিতেই বেশ।

এখানে ভারি ভালো পাইনের হাওয়া। আমার আগে অনেকেই বোধ করি এ-মন্তব্যটা ক'রে গেছেন: কিন্তু যেহেতু অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে নতুন, মন্তব্যটাও নতুন মনে হচ্ছে। এ-অঞ্চলে মোটরের রাস্তাগুলো চমৎকার—কিন্তু সে-কথাও "শেষের কবিতা" প'ড়ে থাকবেন। হায়রে, লেখকদের জ্বালায় কোনো কথা যদি বলবার উপায় থাকতো!

মায়া

পুঃ—মার্ক টোয়েনের বইখানা আমার এত বেশি ভালো লেগেছে যে আপনাকে না-পাঠিয়ে পারলুম না। দিবানিদ্রার ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হোক।

বইখানা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। পরে পাঠাচ্ছি। চিঠি লিখবেন।'

শিলং
১৭ মে

'বন্ধুবরেষু,

আজ হঠাৎ বৃষ্টি এলো। বেশ একটু ঠাণ্ডা নেমেছে; ব'সে আছি শার্সি-আঁটা জানলায় শালমুড়ি দিয়ে। আকাশটা মন-মরা,

বাতাসে শীত, গাছপালা ঘোলাটে। ভালো লাগছে না। কী-করি কী-করি গোছের একটা খুঁতখুঁতানি মনটাকে কামড়ে ধরেছে। এ-অঞ্চলের বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে অনেক শুনেছি: ভয়ে মরছি এমনি চলবে না তো দিনের পর দিন? কোন সুখের আশায় যে মানুষ এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় আসে—যখন দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির কারখানার অদৃশ্য কারসাজির উপরেই নির্ভর করে আমাদের সমস্ত সুখ। কী একটু ডিপ্রেশন হ'লো বে অব বেঙ্গলে ঈশ্বর জানেন, তার ফলে বৃষ্টি এলো ঝমঝম, আমাদের সব উৎসাহের উপর পড়লো মেঘের ভিজে কম্বলচাপা।

আজ কিছু করবার নেই, কিছু ভাববার নেই; টপসি সকাল থেকে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ওর কম্বলখানার উপর গোল হ'য়ে। মানুষের উপর এইখানে ওর মস্ত জিৎ। যখনই দেখলো বেড়াবার খেলবার সুবিধে হবে না, দিলে লম্বা ঘুম মনের শান্তিতে। মেনে নিলে দুরবস্থাটা অনায়াসে। আমরা ও-রকম ক'রে ঘুমোতে পারি না; কিছু ভালো না-লাগলেও, কিছু করবার না-থাকলেও জেগে থাকি, হাঁটাচলা করি, মন-খারাপ করি। এখন শুধু মনে হচ্ছে যদি আর-কেউ থাকতো, এই জানলার ধারে মুখোমুখি চেয়ার টেনে ব'সে গল্প করতে পারতুম, আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে, মাঝখানে শাদা পেয়ালার মুখে উঠতো শাদা ধোঁয়া, তারপর হয়তো বৃষ্টি থামতো, ঝিকমিকিয়ে উঠতো রোদ, অনেকক্ষণ গল্প ক'রে হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়াটাও যেন তেমনি।

আশাটা বিশেষ-কিছু নয়, এর চেয়ে অনেক বড়ো-বড়ো আশা মানুষ করেছে—এবং পূর্ণ করেছে, শুনেছি। কিন্তু সম্প্রতি আমার এই অতি ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না; এবং এ-চিঠি যদি আরো লিখতে থাকি, তাহ'লে এই মন-খারাপের

হাওয়া থেকে এমন সব কথা সম্ভবত লিখতে থাকবো, যা নিয়ে দেখা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই অনেক ঠাট্টা করবেন। অতএব, হে বন্ধু, বিদায়।

আপনি কেমন আছেন?

মায়া।

মার্ক টোয়েনের বইটা পাওয়া গেছে, কিন্তু কোথায় কাঁচি কোথায় সুতো কোথায় ব্রাউনপেপার—এই বাদলার দিনে সহজ নাকি বই প্যাক করা! যদি মনের ইচ্ছার সঙ্গে এই সব স্থাবর বস্তু স্থান থেকে স্থানান্তরে চালান করা যেতো তাহ'লে আর কথা ছিলো না।

চিঠি লিখবেন লম্বা ক'রে।'

'—লারমিনি স্ট্রিট
ওয়াড়ি, ঢাকা
১৯ মে, রাত্রি

প্রীতিভাজনাসু,

লম্বা চিঠি লেখার হুকুম করেছেন; কাল আপনার চিঠি পেয়ে তেমনি একটা ঝোঁক হয়েছিলো, সত্যি বলতে। কালই যদি লিখে ফেলতুম, তাহ'লে ধাঁ ক'রে লেখা হ'য়ে যেতো, তারপর ব'সে-ব'সে ফের আপনার চিঠি আসবার আশায় দিন গুনতে পারতুম। কিন্তু আজ আবার আপনার চিঠি পেয়ে আমার ভিতরটা যেন বিষম একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুলিয়ে উঠছে: কাল যে-সব ভালো-ভালো কথা মনে-মনে সাজিয়েছিলুম, কোথাকার একটা দস্যি হাওয়া এসে সেগুলোকে এক দমকে ওলোটপালোট ক'রে দিয়ে গেলো।

একটু বৃষ্টি হয়েছে ব'লে আপনি তো কত মন-খারাপ করছেন। এদিকে আমরা তাকিয়ে আছি হাঁ ক'রে আকাশের দিকে—হা-মেঘ হা-মেঘ ছাড়া কারো মুখে কথা নেই, কিন্তু আকাশটা সারাদিন পাৎলা শিষের পাতের মতো ধ্বকধ্বক ক'রে জ্বলছে, আর রাতগুলো এমন চাপা যে নিশ্বাস পড়ে না। কখনো যদি একটু হাওয়া দেয়, মনে হয় ডিরেক্ট স্বর্গ থেকে চ'লে এলো ইন্দ্রাণীর অঞ্চল-তাড়িত হ'য়ে। কাগজ প'ড়ে জানা গেলো, মনসুন আসার তারিখ পার হ'য়ে গেছে···রাস্তার মধ্যিখানে সে-বেচারীর কী অপঘাত ঘটলো তা-ই ভাবছি। ক'ষে রাগ ক'রে আলিপুর আপিশের উদ্দেশে কেউ একটা চিঠি লিখছে না কোনো পত্রিকায়, এতে অবাক না হ'য়ে পারছি না। আপনাকে বলিনি বাংলা কাগজের সেই সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা? সেবার হাওয়া-আপিশের ডক্টর সেন গিয়েছিলেন এক হিমালয়-অভিযানের সাহায্যে। তা-ই নিয়ে বঙ্গ-জন-গণ-মনের সেই প্রতিনিধি যথেষ্ট ইনডিগনেশন-সহকারে বলেছিলেন—"আমরা কলিকাতাবাসীরা গরমে পুড়িয়া মরিতেছি, এদিকে ডক্টর সেন কী করিতেছেন? তিনি পাহাড়ে গিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন।" সত্যি, কী অন্যায়! সেন-সাহেবের আপিশে বৃষ্টি তৈরির সব মাল-মশলা মজুত, তাতে তালাবন্ধ ক'রে তিনি কিনা পালালেন পাহাড়ে!

কিন্তু জানেন, আপনার যে মাঝে-মাঝে মন-খারাপ হয়, এটা জেনে মনের মধ্যে ভারি একটা আরাম পাচ্ছি। আমার যেন ধারণা হ'য়ে গিয়েছিলো আপনি সব সময়েই হাসিখুশি ঝকঝকে ফিটফাট—ইন টিপটপ কণ্ডিশন। সেটা দেখতে ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা কিছু শৌখিন—পোশাকি, কী বলেন? আপনার সেই পোশাকি মানুষের সঙ্গেই আমার পরিচয়। তাকে যতই

ভালো লাগুক, চলতে হয় সমীহ ক'রে। কিন্তু এই যে আপনি লিখেছেন, মনটা আজ ভালো লাগছে না, এতে যেন এক ঝলকে আর-একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেলো। সে-মানুষ আটপৌরে, সে-মানুষ প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনের চিরকালের চেনা। যার মন-খারাপ লাগে, এবং সে-কথাটা যে স্বীকার করে, সে তখনই অনেকটা কাছে এসে যায়—তাকে তখনই চিনতে পারি আমারই মতো হাজার সুখে-দুঃখে আশায়-ব্যর্থতায় জড়ানো একজন মানুষ ব'লে। যদিও সে পর মুহূর্তে সাবধান হ'য়ে যায়, পাছে পরে তাকে সইতে হয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

হায় রে, এখানে আমার যদি একদিন একটু মন-খারাপও হ'তো। সেটা একটা পজিটিভ অবস্থা, সেটা বিশেষ একটা-কিছু: আমার এই ঘামে আর ঘুমে হাঁপিয়ে-ওঠা লম্বা দুপুরের শূন্যতা থেকে মস্ত রেহাই সেটা। ভাবছি, সাইকলজির যে-সংক্ষিপ্ত সার আমার বাক্সের তলায় অবস্থান করছে সেখানাই টেনে বার করি। পড়তে-পড়তে হয়তো দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। এবং সেই দৃষ্টির জোরে নিজের ভিতরটা দেখতে-দেখতে এমন মুগ্ধ হ'য়ে যাবো যে বাইরের জিনিশের কোনো অর্থ ই আর থাকবে না। কিন্তু যদি মুগ্ধ না হই? যদি আতঙ্কে শিউরে উঠি?

সেইজন্যই, মায়া দেবী, সেইজন্যই সাইকলজির বই আমার খোলা হচ্ছে না। প'ড়ে থাক বই, নিজের মনের মধ্যে কী আছে, তলিয়ে দেখে লাভ কী? শান্তশিষ্ট ভদ্র চেহারা নিয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে দিনগুলো কেটে গেলেই হ'লো। কিন্তু মেজাজটাও সব সময় ঠাণ্ডা রাখা যায় না, এই যা আপশোশ। আচ্ছা, আপনি তাস খেলেন? যদি তাস খেলার প্রতি আপনার এমন একটা তীব্র বিতৃষ্ণা জ'ন্মে থাকে যে তার চাইতে দুপুরবেলায়

পুরোপুরি দু-ঘণ্টা ঘুমোনোও ভালো মনে করেন, আর কেউ যদি আপনাকে জোর ক'রে সেই তাস খেলায় বসাতে চায়, তাহ'লে কেমন লাগে আপনার? আপনি দয়া ক'রে মার্ক টোয়েনের বই পাঠাতে চেয়েছেন: না-ই বা পাঠালেন। চাই না মজার বই, চাই না হাসতে—বিশ্বাস করুন, এবারকার এই গ্রীষ্মের ছুটিতে আর-কিছুই চাই না—যদি মাঝে-মাঝে আপনার চিঠি পাই। কেমন এবার? দেখলেন তো, অভাজনকে প্রশ্রয় দিলে কেমন হয়? আর দু-দিন পরে হয়তো চিঠি না-পেলে রাগই করবো। ভালো চান তো এখন থেকেই সামাল দিন।

সামনের চিঠিতে জানাবেন বৃষ্টি কেটে গিয়ে ঝিকমিকিয়ে রোদ্দ উঠেছে কিনা আকাশ ভ'রে। অনেকবার বৃষ্টি পড়বে, অনেকবার রোদ উঠবে বৃষ্টির পরে: হবে না শুধু মুখোমুখি চেয়ারে ব'সে দু-জনে গল্প করা, আর সমস্ত গল্পের পরে সোনায়-ভ'রে-ওঠা সেই চুপ-ক'রে থাকা।

টপসি কেমন আছে? তাকে আমার ভালোবাসা দেবেন।

সুমন্ত্র।

'আচ্ছা, আপনি পেন্সিলে চিঠি লেখেন কেন? আর এমন শক্ত পেন্সিলে? আঙুল ব্যথা করে না? এত হালকা হ'য়ে লেখা পড়ে—প্রায়ই মাঝে-মাঝে কথা বুঝতে পারি না—প্রথমটায়। পরে অবশ্য বার-বার প'ড়ে অনেক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে উদ্ধার করি—আপনার চিঠি থেকে একটি ছোটো কথা হারাতেও আমি রাজি নই।'

'শিলং
২১ মে

'সুমন্ত্রেষু,

নামের পর বহুবচন প্রয়োগ করাটা কেমন জানি না; কিন্তু মানুষের পক্ষে বহু চরণের অধিকারী হওয়ার চাইতে বহু নামের ভাগী হওয়া বরং সম্ভব; আর, এক হিশেবে এ-কথা বলা তো খুবই সংগত যে আপনি একজন সুমন্ত্র নন, অনেকগুলো সুমন্ত্র। জিকল-হাইডের বিভাগটা চমকপ্রদ হ'লেও কিছু গায়ে-পড়া: আসলে প্রতি মানুষের মধ্যে জিকল ও হাইডের অসংখ্য স্তরবিভাগ পাশাপাশি লাফালাফি দাপাদাপি করছে। যদি জিকল-হাইডরূপী সুস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন যুগল-কক্ষ নিয়েই মানুষের মনের রচনা হ'তো, তাহ'লে কী সহজই না হ'তো জীবন!

খুব বিজ্ঞের মতো কথা বললুম: এবার এটা শুনুন। প্রতি বারই বেড়াতে বেরোবার সময় যখন জিনিশপত্র বাঁধাছাঁদা হ'তে থাকে, দুটি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে আমার মনের আশঙ্কা আর কাটে না। কেবলই ভয় হয় ফেলে যাবো—হয় টুথব্রাশ, নয় ফাউণ্টেনপেন, নয় দু-ই। সেইজন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও-দুটি জিনিশ আমি চোখের সামনে কোথাও ফেলে রাখি, রওনা হবো-হবো এমন সময় তাদের কুড়িয়ে নিই আর কোথায় জায়গা না হয় আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। নামে 'ভ্যানিটি' ব্যাগ হ'লেও জিনিশটি কত যে কাজে লাগে ভাবতে পারেন না। আপনাদের জামার পকেটকে যদি ভ্যানিটি পকেট বলি তাহ'লে কেমন হয়? এবারেও, দেখুন, সরল বিশ্বাসে ও-দুটি জিনিশ ড্রেসিং টেবিলের উপরে রেখে টপসির ও নিজের প্রসাধন সমাপন করছি—শেষ মুহূর্তে আমার সেই চিকচিকে কালো, ভায়োলেট কালি ভরা কলম

এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে কে জানতো। এখানে এসে দেখি নেই, নেই তো নেই। মনকে সান্ত্বনা দিলুম—থাকগে, কী-ই বা হ'তো কলম দিয়ে, টুথব্রাশটি যে দয়া ক'রে এসেছেন সেজন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তার পরে যখন আপনাকে চিঠি লেখার কথা মনে হ'লো তখন হাতের কাছে প্রথমে যা পাওয়া গেলো সেই শক্ত পেন্সিলটাতেই সুরু ক'রে দিলুম। এ-যন্ত্রটিকে লেখনী বলা যায় না, তবু এ অল্প আয়াসে প্রমাণ করলে যে এর দ্বারাও অক্ষর আঁকা যায় অসময়ে। ইতি পেন্সিল-পর্ব।

এক হিশেবে ভালোই হ'লো; তবু তো আক্ষরিক অস্পষ্টতার জন্য আপনি একাধিকবার আমার চিঠিগুলো পড়েন। যদি হাতে থাকতো কলম তবে সেই ঝকঝকে কালির আঁচড় সুবোধ্য হ'তো প্রথম দর্শনেই, এবং তার অনুশীলন প্রথম পাঠেই শেষ হ'তো। সুতরাং, যদিচ চেষ্টা করলে কিছু কালি-কলম সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, তবু এই পেন্সিলের মায়া যেন কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আঙুল ব্যথা করে বইকি—তা করুক।

বৃষ্টি কেটে গেছে। এখানকার বৃষ্টিটা যেমন বিশ্রী তার কেটে-যাওয়াটা তেমনি সুন্দর। কে একজন অসম্ভব খুশি হ'য়ে সারা আকাশ ভ'রে হেসে ওঠে। তারপর কোথায় জুতো কোথায় গায়ের জামা কোথায় বর্ষাতি, চলো বাইরে, টপসি, টপসি, চল বেড়িয়ে আসি। অসম্ভব এখানে সুখী না-হওয়া, বৃষ্টি কেটে গিয়ে যখন রোদ ওঠে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের বুক-চেরা, চলতে-চলতে হঠাৎ একটা ঝরনা কথা ক'য়ে উঠলো, আর চারদিকে পাইনের পাতায়-পাতায় অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাস। যে-রাস্তা আঁকাবাঁকা তাতে অনেক রহস্য, কী আছে প্রতি বাঁকে, কী না জানি আছে, বুকটা কাঁপে যেন। আধুনিক শহরের পথ-ঘাট

জ্যামিতির রেখার মতো সরল: তার সুবিধে অনেক। রহস্যের রোমাঞ্চের বদলে সুবিধের আরাম: আধুনিক সভ্যতা এইদিকেই চলেছে প্রতি পদে। কলকাতার উত্তর অঞ্চলে এখনো আছে অনেক গলি, অদ্ভুত তার জটিলতা, অদ্ভুত আলো-ছায়ার খেলা। অনায়াসেই মনে করা যায়, রাত বারোটার সময় শাদা-কাপড়-পরা কোনো মূর্তি আপনার পিছনে এসে ফিশফিশ ক'রে কথা কইবে, তারপর হঠাৎ মিলিয়ে যাবে শাদা দেয়ালের গায়ে। ভাবছি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-এর কাজ একেবারে শেষ হবার আগে সে-সব গলি ভালো ক'রে একবার ঘুরে আসবো—দু-একটা ভূতের দেখা যদি মেলে, গল্প করার মতো কিছু হবে বটে। (আমি ভূতে বিশ্বাস করি।)

কিন্তু জানেন, কাল আমি নিজেই প্রায় ভূত হ'তে চলেছিলুম। এমন সর্বনেশে এখানকার কুয়াশা কে জানতো। এসে অবধি কুয়াশা-টুয়াশা বড়ো দেখিনি, ভেবেছিলুম অমনি বুঝি। কাল ভোরে উঠে দেখি—ও মা, কিচ্ছু নেই তো, সব মুছে গেছে। বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি কুজ্ঝটিকা আহার করতে। চেনা পথ দিয়ে অনেক দূর চ'লে গেলুম—নিজের হাত নিজেই দেখা যায় না। তারপর কুয়াশা খেতে-খেতে অন্য রকম খাদ্যের দিকে ইচ্ছে জাগলো—মানে, খিদে পেলো। বাড়ির দিকে পা ফেরালুম। পা অনেকবার ফিরলো, বাড়ি কাছে এলো না। এদিকে কুয়াশা নামলো আরো, আরো ঘন হ'য়ে। সত্যিই কিছু আর রইলো না। তবু নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে এগিয়ে চললুম, বাড়ি পৌঁছতে পারবোই—ভাবনা কী? কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হ'লো যে-পথ দিয়ে চলেছি সেটা অতি সংকীর্ণ, আর দু-দিকে খাদ নেমে গেছে অতি গভীর। এটা বুঝতে পারলুম নেহাৎই বুদ্ধিবৃত্তির জোরে, কেননা চোখে যতটা এবং যতদূর দেখা যায়—তা শুধুই

বিশাল নিস্পন্দ কুয়াশার একটি সমুদ্র। বেশ ছিলুম অজ্ঞানে, কিন্তু এই চৈতন্যোদয় হবার পর থেকে যা অবস্থা হ'লো সে আর বলবার নয়। একবার পা ফেলি আর মনে হয় এই বুঝি হ'লো মায়াদেবীর পাতালপ্রবেশ। দু-তিন হাজার ফুট নিচে পড়তে-পড়তে মাঝপথেই জ্ঞান লুপ্ত হবে, সুতরাং মৃত্যুটা কষ্টের হবে না, এই কথা চিন্তা ক'রে মনকে যথাসাধ্য প্রবোধ দিলুম। মা-র কথা মনে পড়লো, বাবার কথা মনে পড়লো, আপনার কথা। কিন্তু কারো কথাই বেশি ভাববার সময় ছিলো না, মন-প্রাণের সবটুকু শক্তি নিঃশেষে নিয়োজিত হয়েছিলো প্রতিবারের প্রতিটি পা-ফেলায়।

যা-ই হোক, আমি যে এখন সশরীরে জীবিত তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। মা-বাবাকে এখনো বলিনি কথাটা—বিরাট ভয়টা ম'রে আসতে-আসতেও এখনো একটু-একটু চিমটি কাটছে মনের মধ্যে। ভাগ্যিশ সেদিন টপসি ছিলো না আমার সঙ্গে। শুভযোগে একদিন সেই রাস্তাটা আবার ঘুরে আসতে হবে। ধরুন, গিয়ে যদি দেখি কিছুই না, ও আমার মনের ভুল! সেই চীনে ডাকাতদের গল্প জানেন তো—এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে তারা ধরলে, সাব্যস্ত হ'লো প্রাণদণ্ড। পরে সর্দার দয়া ক'রে বললেন—তোমাকে আমরা রেখে যাচ্ছি এই নির্জন পাহাড়ের চূড়োয়। যদি হাত পিছলে প'ড়ে যাও, নিচে অতল মৃত্যু। আর যদি দৈবাৎ কেউ তোমাকে উদ্ধার করে তো প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেয়ো, আমাদের আর ঘাঁটাতে এসো না। বেচারা ইংরেজ দু-হাতে প্রাণপণে আঁকড়ে ঝুলে রইলো সমস্ত রাত, একটুর জন্যে সে পা তুলে উঠতে পারে না, একটুর জন্যে পা বাড়িয়ে পায় না ওদিকের নিরাপদ আশ্রয়। এমনি ক'রে অন্ধকার রাত কেটে গেলো,

তারপর ভোর যখন হয়-হয়—মনে-মনে একবার যীশুর নাম নিয়ে দিলে হাত ছেড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে পড়লো হুমড়ি খেয়ে এক বালুর ঢিবির উপর। ভোরের আলোয় দেখা গেলো যে তার ঝুলন্ত পা দুটোর ইঞ্চি কয়েক নিচেই ছিলো বালুর নরম বিছানা। সত্যি, চীনেরাই প্রকৃত সভ্য জাত।

টপসি ভালো আছে। বেজায় দস্যি হয়েছে এখানে এসে। কোথায় থাকে কী করে, খোঁজই নেই শ্রীমানের। কেবল খাওয়ার সময়ে ঠিক এসে হাজির মূর্তিমান জঠরানল। কী ক'রে টের পায়? দার্শনিকের উল্লিখিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি এই? আমরা যখন হাত থেকে মুখে খাদ্য চালান করি, এমন অনিমেষ নয়নে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যে সে একটা দেখবার জিনিশ! খাওয়া হ'লো তো আবার ছুট। হয়তো রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে পরবর্তী ভোজনের আয়োজন পর্যবেক্ষণ ক'রে এলো। যদি ডাকতে পারলুম—টপসি! টপসি! দৌড়ে ছুটে এসে হা-হা ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোলে। খুব ভালো, টপসি।

আপনি কেমন আছেন সব জানাবেন।

মায়া'

'ঢাকা

২৫ মে

'কেমন আছি বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। সে-সব থাক। সম্প্রতি কলেজে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ আমার পক্ষে এই হ'য়ে উঠেছিলো যে সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এবং আমার এখানকার জীবনধারণের প্রধান আকর্ষণই এ-ই যে

সপ্তাহে দু-বার আপনার চিঠি পাই। এক হিশেবে বোধহয় ভালোই হয়েছে যে আমার শিলং যাওয়া হয়নি। এই চিঠিগুলো তবে কোথায় পেতুম? কতদিন কত কথা তো হয়েছে আপনার সঙ্গে—কিছু মনে আছে? কিছু কি ধ'রে রাখতে পেরেছি কোনো-খানে? সময়ের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে ওরা। কিন্তু আপনার এই চিঠিগুলো রইলো, রইলো আমার বাক্সের তলায়, রইলো আমার মনের তলায়, চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখে দিলুম দস্যু সময়ের হাত থেকে ছিনিয়ে—আপনার এই যেমন-খুশি-বলা, মনে-ঢেউ-তোলা, পেন্সিলে-লেখা অপ্রস্তুত চিঠিগুলো। আপনি হয়তো জানেন না—'

উঠে যেতে হয়েছিলো পিতৃদেবের তলবে। ফিরে এসে আর-কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। বৃথা মানুষ নিজের মন নিয়ে গর্ব করে—সে-মন তো এক টুকরো মেঘের মতো, আকাশের অসংখ্য হাওয়ার শখের খেলেনা মাত্র। আপনার চিঠির হাওয়ায় যে-মন চলেছিলো পাখা মেলে স্বর্গের দিকে, পৈতৃক অনুশাসনের ধাক্কায় তা এখন পাতালগামী। যেন একটা পাখা-ভাঙা এরোপ্লেন ঝাপটে-ঝাপটে ডুবছে, নিচে রয়েছে হাঁ ক'রে অতল কাল জল।

সুমন্ত্র।'

*

'তোকে শিলঙ থেকে কে এত চিঠি লেখে রে ঘন-ঘন? মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়।'

আপিশ-ঘর। মক্কেলরা আজ একটু সকাল-সকালই বিদায় নিয়েছে। হাতে সময় আছে, হৃষীকেশবাবু ডেকে পাঠালেন জ্যেষ্ঠ

পুত্রকে। ঈষৎ-দোমড়ানো ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে সুমন্ত্র ঘরে ঢুকলো। এবার এসে এ-ঘরে এই প্রথম তার পদার্পণ। দেয়ালের গা ঘেঁষে কাচের আলমারির সারি বৃহদাকার আইন-গ্রন্থে ঠাশা; এক-একখানা বই এক বছরের শিশুর মতো ভারি। ঘড়ি টিকটিক করছে আইনজ্ঞের মুখোমুখি দেয়ালে। পিতাপুত্রের মধ্যবর্তী বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে দলিল-পত্রের ঠেশাঠেশি ভিড়। হৃষীকেশ-বাবুর সামনে একখানা কাগজ, সুমন্ত্র যখন ঢুকলো তাঁর চোখ ও মন তারই অধ্যয়নে নিবদ্ধ। ছেলের পায়ের শব্দ শুনে চোখ না-তুলেই তিনি বললেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ, পেশাদারি ঢঙে :

'বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

সুমন্ত্র বসলো। নিজেকে শক্ত ক'রে নিলো ভিতরে-ভিতরে, নিলো তৈরি হ'য়ে। প্রবীণতার দৃশ্যে ঘাবড়াবে না সে, গম্ভীর বিজ্ঞতার মুখোমুখিত্বে ভয় পাবে না। এমনি কাটলো খানিকক্ষণ, তারপর হৃষীকেশবাবু কাগজটা সরিয়ে রেখে চোখের চশমা নামিয়ে সুমন্ত্রর দিকে তাকালেন। হালকা সুরে বললেন :

'তোকে শিলং থেকে কে এত চিঠি লেখে রে ঘন-ঘন? মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়।'

এমনভাবে বললেন কথাটা যাতে স্পষ্টই বোঝা যেতে পারে এটাই আসল কথা নয়, এটা আকস্মিক প্রসঙ্গমাত্র—যেন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, এমনি ভাব।

সুমন্ত্র বললে : 'আমার এক বন্ধু। ওর হাতের লেখা মেয়েলি।'

'বন্ধু—কোথাকার বন্ধু?'

'কলেজের। একসঙ্গে পড়ি আমরা।'

'ও। সে শিলং গেছে বুঝি ছুটিতে?'

'আমিও যেতে চেয়েছিলুম সেই সঙ্গে।'

'যেতে চাওয়াটা অন্যায় হয়েছিলো তা আমি বলবো না। আর-একজনকে দেখলে ও-রকম শখ হয়ই তোমার বয়সে। তবে তুমি তো এখন আর নিতান্ত ছেলেমানুষ নও। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার বয়সের সাধারণ ছেলের চাইতে তোমার চিন্তাশক্তি কিছু বেশি। টাকা-পয়সার দিকটা এখন কি তোমার ভাবা উচিত নয়?'

'গেলে তো ওদের বাড়িতেই থাকতুম, কেবল যাওয়া-আসার খরচাটা। সে আর এমন কী। এখানেও তো এলুম।'

'তুমি কি বলতে চাও সারা ছুটিটা তুমি ওখানেই কাটাতে? এখানে আসতে না?'

সুমন্ত্র চুপ ক'রে রইলো।

হৃষীকেশবাবু তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকালেন:

'মন্তু, তোমার মধ্যে একটা জিনিশ লক্ষ্য ক'রে আমি বড়ো দুঃখিত হয়েছি। তোমার পরিবারের প্রতি একেবারেই তোমার সহানুভূতি নেই।'

'পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?' কথাটা প্রায় সুমন্ত্রর মুখে এসে পড়েছিলো, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে:

'কী করলে তোমাদের বিশ্বাস হবে যে আমার সহানুভূতির অভাব নেই?'

হৃষীকেশবাবু ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন।

'তুমি যদি সহানুভূতি দেখাতে যেতে, আরো বেশি দুঃখিত হতুম। কিন্তু প্রাণে যে তোমার এক ফোঁটা দরদ নেই সেটাই আশ্চর্য।'

সুমন্ত্র কোনো জবাব দিলে না।

'এই একটা কথাই ধরো,' হৃষীকেশবাবু তাঁর পক্ষে আশ্চর্য

শান্তভাবে বলতে লাগলেন: 'তুমি আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা নাও মাসে-মাসে। স্কলার্শিপ পাও কুড়ি টাকা। বাংলাদেশে ষাট টাকা অনেক কেরানিরও আয় নয়। তুমি কলেজে পড়ো, থাকো হস্টেলে। কী করো এত টাকা দিয়ে?'

'খরচ করি,' সুমন্ত্র নিশ্চিন্তভাবে কথাটা বললে, চোখের পলক পড়লো না।

হঠাৎ টেবিলে প্রচণ্ড চড় দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন হৃষীকেশ-বাবু: খরচ করো! কী তোমার এত খরচ! এতেও তো তোমার চলে না। এটা-ওটা ছুতো ক'রে প্রতি মাসেই তো বেশি টাকা চেয়ে পাঠাও। গোপনে নাও তোমার মা-র কাছ থেকে। না-পেলে রাগ করতেও শিখেছো।'

সুমন্ত্র একটু চুপ ক'রে রইলো, বাবা আর-কিছু বলেন কিনা বোধহয় সেই অপেক্ষায়। তারপর আস্তে আস্তে বললে: 'কলেজের মাইনে আর হস্টেলেই তো তিরিশ টাকা যায়।'

'আর? তোমার আর কী খরচ, শুনি?'

'আর খরচ নেই মানুষের? আমি কি একটা পশু নাকি?'

'আর যা খরচ পাঁচ টাকাতেই কুলিয়ে যাওয়া উচিত। বেশি ক'রে দশ টাকাই ধরলুম না-হয়। আমরা যখন কলেজে পড়তুম—'

'সে-কথা বার-বার বলো কেন? তোমাদের সময় আর নেই, দিনকাল বদলে গেছে—'

'তা বেশ বুঝতে পারছি। যত সব দায়িত্বজ্ঞানহীন উড়নচণ্ডী নির্বোধ—'

'বেশ, হিশেব চাও তো হিসেব দিচ্ছি,' বেশ উচ্চস্বরেই সুমন্ত্র জবাব দিলে। 'দু-বেলা চা খাওয়া আছে, এবং চা মানে শুধুই চা নয়—'

'কত তোমাদের খাওয়ার দিকে নজর তা তো জানি। খাও তো রেস্টোর‍্যাণ্টে গিয়ে সাপের চর্বিতে ভাজা কুকুরের চপ—'

'কোথায় পাবো আর? বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে মুরগির কটলেট কে আমাকে ভেজে দেবে?'

'তোমার পিসেমশাই আছেন কলকাতায়, তোমার হস্টেল থেকে দূরও নয় তাঁর বাসা। কথা ছিলো, তুমি কলেজ থেকে তাঁর ওখানে গিয়ে বিকেলের খাওয়াটা খাবে—'

সুমন্ত্র ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, 'পরের বাড়িতে রোজ-রোজ খেতে আমার লজ্জা করে।'

'আহা—তাঁরা তো অক্ষম নন, অনিচ্ছুকও নন। কত খুশি হয় সবাই তুমি গেলে। আর অনাদিবাবু আমাকে লিখেছেন, চার মাসের মধ্যেও তুমি তাঁর ওখানে যাও না। তিনিই বুঝি একদিন হস্টেলে গিয়েছিলেন তোমার খোঁজ নিতে, তাও তোমার দর্শন মেলেনি।'

'ও-বাড়িতে আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না! ওরা কিনা আপন, ওরা কিনা ভালোবাসে—'

'আপন? আত্মীয়। আত্মীয় হ'লেই কি আপন হয়? আত্মীয় হ'লেই ভালো লাগতে হবে, মানুষের উপর এ কী অন্যায় জবরদস্তি!'

হৃষীকেশবাবু স্তম্ভিত হ'য়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে উচ্চশিক্ষার যোগ্য তুমি নও। কেবল বইয়ে-পড়া বুলি—'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো সুমন্ত্র: 'কাকে ভালো লাগবে আর কাকে লাগবে না, সে-কথাও কি বইয়ে লেখা থাকে নাকি? তুমিও তো কোনোদিন বই-টই পড়েছিলে।'

হৃষীকেশবাবু লম্বা নিশ্বাসে অনেকখানি বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

'পড়েছিলাম—কিন্তু—' হঠাৎ সমস্ত বাঁধ ভেঙে তিনি গর্জন ক'রে উঠলেন: 'কিন্তু এত বেশি পড়িনি যাতে তোমার মতো নির্বোধ, দাম্ভিক, গর্দভ হ'তে পারি!'

ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠলো সুমন্ত্রের মুখ; টুকটুকে কান নিয়ে মাথা নিচু ক'রে রইলো সে।

'আর তোমাকে দিয়ে কত-কিছু আশা করেছিলুম আমি! ভুল হয়েছিলো তোমাকে কলকাতা পাঠানোই—স্বাধীনতা তোমার সইলো না।'

সুমন্ত্র হঠাৎ ব'লে উঠলো, তীব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝেঁকে, 'কেন এ-কথা বলছো তুমি? কী করেছি আমি?'

'উচ্ছন্নে যাচ্ছো—অতি অল্প কথায় এই হচ্ছে তোমার অবস্থা।'

ঝলসে উঠলো সুমন্ত্রর চোখ, একটা চাপা বিদ্যুৎ আহত সাপের মতো লাফিয়ে উঠলো যেন—'কেন, কী করেছি আমি? কী করেছি? কেন এ-সব যা-তা বলছো আমাকে? যা তোমাদের মুখে আসে তা-ই যে আমাকে বলতে পাবো তা তো এই কারণেই যে আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিই? বেশ, নেবো না আমি তোমার টাকা, আর নেবো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নেবো।'

এমন একটা ধাক্কা লাগলো হৃষীকেশবাবুর, বুকের মধ্যে টনটন ক'রে উঠলো। মন্তু আজ এ-কথা বলছে, মন্তু! কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যথা গেলো কেটে, ঠেলে উঠলো রাগের স্রোত, রাগের লাল জোয়ারে তিনি অন্ধ হ'য়ে গেলেন। মারতে পারতেন তিনি, তাঁর এই অবাধ্য নির্বোধ উদ্ধত ছেলেকে হাত তুলে মারতে পারতেন

যদি না হঠাৎ তাঁর রাগ ফেটে পড়তো প্রচণ্ড অট্টহাস্যে। সে-হাসি এমনি আকস্মিক ও অদ্ভুত যে সুমন্ত্রও চমকে কেঁপে উঠলো।

'এতক্ষণে তুমি প্রমাণ করলে যে তুমি সত্য-সত্যই মূঢ়। তোমাকে টাকা দিয়ে আমি তোমাকে যা-তা বলবার অধিকার উপার্জন করেছি! তুমি আমার চাকর কিনা! আর্থিক একটা বাধ্যবাধকতা আছে ব'লেই তুমি—'

হৃষীকেশবাবুকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো: 'টাকার হিশেব চাইতে তো ভোলো না তুমি—'

'একশোবার চাইবো!' হৃষীকেশবাবু এমন এক ঘুষি মারলেন টেবিলে যে কাচের কাগজ চাপাগুলো নেচে উঠলো। 'আমার টাকা, তার হিশেব একশোবার চাইবো আমি। তোমার মঙ্গলের জন্যও সেটাই দরকার। কার রক্ত-জল-করা টাকা। অনায়াসে সিগারেটের ধোঁয়া ক'রে তুমি উড়িয়ে দাও, একবার ভাবো সে-কথা।'

ঠোঁটের এক কোণ কামড়ে সুমন্ত্র বললে: 'কারো রক্ত-জল-করা টাকাই নয়। আমার টাকা।'

'তোমার টাকা!' হৃষীকেশবাবু এমন সুরে কথাটা বললেন যে সুমন্ত্রর চোখ তুলে তাকিয়ে জবাব দিতে রীতিমতো শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হ'লো।

'আমার টাকা। আমার স্কলার্শিপের টাকা।'

'বদখেয়ালে ওড়াবার জন্যেই তোমাকে স্কলারশিপ দেয়, না?'

'যারা ওটা দেয়, তারা দিয়েই দেয়, হিশেব চায় না। আর-কিছু ছাখে না তারা, খালি পরীক্ষার নম্বর ছাখে।' উজ্জ্বল উত্তেজিত চোখ তুলে সুমন্ত্র তার বাবার দিকে তাকালো। এখানে তার জয়, তার শ্রেষ্ঠতা। পরীক্ষায় তার উঁচু নম্বর, হাজার ছেলের মধ্যে

অনায়াসে সে পয়লা থাকে। আর যা-ই হোক, তার এ-গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

হৃষীকেশবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন :

'তুমি ইতিমধ্যেই "আমার" আর "তোমার" টাকা আলাদা ক'রে দেখতে শিখেছো। তা যদি না-শিখতে তাহ'লে হয়তো তোমার মনে হ'তো যে এর কমেও চলে। হয়তো আমার কাছ থেকে যতটা বেশি পারো আদায় ক'রে নিতে না। হয়তো একবার ভাবতে, অত বড়ো সংসার কেমন ক'রে চলে। মনে করতে পারতে যে আমার আগের মতো রোজগার আর নেই, নেই কোনো সঞ্চয়, এবং শিগগিরই তোমার একটি বোনের বিয়ে দিতে হবে।'

'এত কথা কেন বলছো? আমি তো রাজিই আছি—আমাকে আর টাকা পাঠিয়ো না।'

'স্ত্রীলোকের মতো অভিমান কোরো না, পুরুষ হ'তে শেখো। তোমার কি মনে হয় না, সত্যি-সত্যি তুমি খুব বেশি খরচ করো?'

'বেশি!' সরল বিশ্বাসের সুরে সুমন্ত্র বললে। 'কিছুই না। অভাব আমার লেগেই আছে।'

'ও-অভাব তোমার নিজের সৃষ্টি, তা কখনোই ঘুচবে না— যদি না তুমি অভ্যেস বদলাও। ক-টা ছেলে তোমার মতো খরচ করে, শুনি?'

'অনেক ছেলে আরো অনেক বেশি করে। বাজে খরচ শো-খানেক টাকা করে, এমন ছেলেও পড়ে আমাদের কলেজে।'

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে হৃষীকেশবাবু বললেন : 'মন্তু, তুমি তো ধনীসন্তান নও। আর যদি হ'তেও, তবু ও-রকম মস্তিষ্কহীন অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে পারতুম না আমি।'

'অপব্যয় কেন? ধরো আমি বই কিনতে চাই, ধরো আমি দেশ-বিদেশে বেড়াতে চাই; চাই শ্রেষ্ঠ মানুষদের মনের পরিচয়। তার জন্য আমার যদি টাকা লাগে?'

'মন্তু, তুমি নিজে বড়ো হবে, কোনো ইচ্ছাই হয়তো তোমার অপূর্ণ থাকবে না। মন্তু, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো, আমাদের দিকে একটু তাকাও।'

সুমন্ত্রর মাথা-ঝাঁকুনিতে একগোছা চিকচিকে কালো চুল তার কপালের উপর লাফিয়ে পড়লো।—'আমি কী করলে তোমরা খুশি হবে তা বুঝি না। আমাকে কষ্ট ক'রে যদি থাকতে বলো, তা পারি না ভেবো না। বাধ্য হ'লে সকলেই কষ্ট করে। কিন্তু বাধ্য না-হ'লে কষ্ট করে কে? আমি এমন-কিছু প্রচণ্ড বিলাসিতায় ডুবে থাকি না যাতে এত সব কথা আমাকে শোনাতে পারো। আমি যে-রকম থাকি, যে-রকম চলি সেরকম না-হ'লে আমার চলে না। সেটা অনেকদিনের অভ্যেসের ফল। সে-অভ্যেস করিয়েছো তোমরাই। ফর্শা জামা-কাপড় না-পরলে আমার চলে না, বন্ধুদের মাঝে-মাঝে না-খাওয়ালে আমার চলে না। চলে না সিনেমা না-দেখলে। চলে না এটা-ওটা অনেক-কিছু না-হ'লেই। চলে না যে, সেটা আমার দোষ নয়। আমার যে-রকম জন্ম, যে-রকম শরীর-মন, যে-রকম শিক্ষা, তাতে ওগুলো প্রয়োজন। কত ছেলে কত কষ্ট ক'রে পড়ে তা কি আমি চোখে দেখি না? কত লোক কত দীনভাবে থাকে তা কি জানি না আমি? কিন্তু আমি কি পারি ও-রকম থাকতে? আর কেনই বা থাকবো—তেমন দুরদৃষ্ট নিয়ে যখন জন্মাইনি? দুঃখী হওয়াটাই তো মহৎ কথা নয়: যে যতটা পারে, সুখী হওয়ার চেষ্টাই তো করে সকলে।'

হৃষীকেশবাবু খানিকক্ষণ চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলেন।

'শোনো : আমার বাপ যখন মারা যান, আমার আঠারো বছর বয়স। কলেজে পড়ি। আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু নিরন্ন ছিলেন না ; এবং তাঁর অন্নে আত্মীয়-কুটুম্ব জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ঠিক আমারই সমান অধিকার ছিলো। তারও বেশি—আমরাই ছিলাম অতিথি আশ্রিত উপযাচকের প্রসাদজীবী। যে যা খেতে চায় খাবে, আমরাই কখনো কিছু চাইতে পারবো না। সকলের শোবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে যেখানে-সেখানে আমাদের বিছানা। নিজের ছেলেমেয়ে ব'লে কখনো বিশেষ কোনো যত্ন হ'তো না, নিজের ছেলেমেয়ে ব'লেই হ'তো না। অতিথির কোনোরকম অনাদর করা যায় না, নিজের ছেলে তো নিজেরই ছেলে।'

এখানে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো, 'শুনেছি এ-সব কথা।'

'আবার শোনো। তোমাদের একালের কথা শুনলাম, আমাদের সেকালের কথা কিছু শোনো : বাপ তো মরলেন, একটা পয়সা রেখে গেলেন না। রইলো বিধবা মা, বিবাহযোগ্যা বোন। একটা সংসার পড়লো আমার মাথায়। কলেজ ছেড়ে মাস্টারি নিলুম গ্রামের স্কুলে। কুড়ি টাকা মাইনে। দেশের জমি-জমা বেচে বোনের বিয়ে দিলুম। মাস্টারির ফাঁকে-ফাঁকে পরীক্ষা দেয়া, কত কষ্টে জমতো ফী-এর টাকা। এমনি ক'রে বি. এ. পাশ করলুম, পাশ করলুম বি. এল.। তদ্দিনে স্কুলে তিরিশ টাকা মাইনে পাই।' টিঁকে থাকলে হয়তো একদিন হেডমাস্টারই হ'য়ে যেতাম। হৃষীকেশবাবু তিক্ত, শুষ্কভাবে হাসলেন। আরো বলবার তাঁর নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু, কথাটা যেন শেষ হ'য়ে গেছে এমনিভাবে সুমন্ত্র ব'লে উঠলো :

'তোমার অদৃষ্টে তুমি কষ্ট পেয়েছো। সেটা কি আমার দোষ যে সেজন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ?'

'সমস্ত জীবন ছু-হাতে একা [illegible] [illegible]ছি, একটু ভর দিয়ে দাঁড়াবার কখনো কেউ ছিলো না। [illegible] মনে এ-রকম একটা আশা হয় যে তোমরা আমার ছুঃখ বুঝবে।'

'কিন্তু এখন তো তোমার কোনো ছুঃখই নেই।'

'এখনো চলেছে যুদ্ধ। বয়স হ'য়ে আসছে। এই মস্ত সংসার, মেয়ের বিয়ে আসছে সামনে—তার উপর তোমরা যদি এক-একটি উড়নচণ্ডী হ'য়ে ওঠো—নিজে আমি এ-বয়স পর্যন্ত হিশেব ক'রে চলেছি, আর তুমি আমার ছেলে, এখনই তোমার গরমের দিনে পাহাড়ে না-গেলে চলে না, এখনই তোমার কুড়ি টাকার সিগারেট লাগে মাসে! এ-পর্যন্ত তোর পিছনে যত টাকা খরচ হয়েছে, ক-টা বড়োলোকের ছেলের তা হয় রে? আর তুই এত বড়ো স্বার্থপর গোঁয়ার যে নিজের তুচ্ছ কোনো 'সুখে একটু বাধা পড়লেই উল্টে আমারই উপর রাগ করিস!'

'চুপ করো বাবা, চুপ করো, আর শুনতে চাইনে।' সুমন্ত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তার মুখ আগুনের মতো লাল, বিপর্যস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত চুল। 'কেন করেছিলে খরচ, আমি বলেছিলুম করতে? আমি চেয়েছিলুম পৃথিবীতে আসতে? আমি একটা মস্ত খরচ, এ-কথাই তো এতক্ষণ ধ'রে বোঝালে? কিন্তু এ-খরচটা কেন হ'লো? কে দায়ী আমার অস্তিত্বের জন্য? এই মস্ত সংসার কার? প্রতিদিন একটু-একটু ক'রে আমার উপর এইরকম অত্যাচার করবার চাইতে একবারে ব'লে দাও—আমি যাই চ'লে যেদিকে আমার খুশি।'

একটা বোমা ফাটলো।

'যাও, যাও, এক্ষুনি যাও, বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনা থেকে। উচ্ছন্নে যাও, জাহান্নমে যাও, যাও যেখানে তোমার খুশি। তোর অস্তিত্বের জন্য দায়ী কে, তা তোর মুখ থেকে আমাকে

শুনতে হবে না। তুই আমার ঘোরতর অপকর্ম—তোর জন্মের সময় আমার আনন্দ রাখবার জায়গা ছিলো না; আজ দেখছি সে-জন্ম না-হ'লেই ভালো হ'তো। একটা কথা তোকে ব'লে দিচ্ছি এই: মুহূর্তের জন্যও ভাবিসনে যে আমি তোর কাছে কোনোরকম প্রত্যাশী। ঈশ্বর করুন,' বলতে-বলতে হৃষীকেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'ঈশ্বর করুন, কোনোদিন যেন কারো কাছ থেকে নিতে না হয়। আঠারো বছর বয়স থেকে এ-পর্যন্ত নিজের পায়ে নিজে চ'লে এসেছি, কারো তোয়াক্কা রাখিনি। এ-শরীর যতদিন টিঁকে আছে কিচ্ছু ভয় করিনে। ঈশ্বর করুন, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এমনি যেন খেটে খেয়ে যাই—আর-কিছু চাই না আমি। তুই বুঝি ভেবেছিলি আমি তোর কাছে চাই—তাই জানিয়ে দিলি কে কার জন্য দায়ী? ছী-ছী-ছি, আমিও এমন বোকা তোকে এ-সব কথা বলতে গিয়েছিলুম! যা, যা, এক্ষুনি চ'লে যা তুই এখান থেকে—'

হৃষীকেশবাবু কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

দিনের শেষ। গ্রীষ্মের দীর্ঘ গোধূলি সমস্ত শহরের উপর একটা রঙিন কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে আলো কম, কিন্তু আকাশে চলেছে লাল আভার লীলা। দোতলায় অরুণার কোণের ঘরে পশ্চিমের ছুটো জানলা খোলা; আকাশের আভা লেগেছে শাদা দেয়ালে, লেগেছে একটি সরু সোনালি ফিতে অরুণার কালো চুলে। তার মাথা আনত, হাঁটুর উপর কনুই আর গালের উপর হাত চেপে চুপ ক'রে ব'সে আছে সে। মুখ ফেরানো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চুলের একটু বাঁ দিকে তার সিঁথি, যেন একটি আশ্চর্য পথ

দুরাশার দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। তেমনি লাগছিলো অশোকের চোখে, তেমনি কাঁপছিলো অশোকের বুকে, অরুণার পাশে ব'সে সেই ঝিকিমিকি গোধূলি-বেলায়। কিছু হয়েছে, কিছু বলা হয়েছে দু-জনের মধ্যে, তারপর দু-জনেই চুপ।

এতক্ষণে অশোক বললে, নিশ্বাসের মতো স্বরে: 'অত ভাবছো কী?'

অরুণা কিছু বললে না।

অশোক দু-আঙুলে তার বাহু ঈষৎ স্পর্শ ক'রে বললে: 'বলো না, কী ভাবছো।'

অরুণা মুখ ফেরালো। তার চোখের নিচে একটা লুকোনো ভয়ের ছায়া লাফিয়ে উঠলো যেন।

আবার বললে অশোক: 'এত ভাববার কী আছে?'

অরুণা ম্লান হেসে কপালের উপর হাত বুলোলো একবার। একটু কাটলো চুপচাপ।

'শোনো, শোনো অরুণা,' থেমে-থেমে, মুখ দিয়ে নিশ্বাস টেনে-টেনে বললে অশোক, 'শোনো, আমার দিকে তাকাও।'

'কী, বলো?' আধখানা মুখ ফিরিয়ে অরুণা বললে।

'তুমি নিজে দেখেছিলে চিঠিটা?' কথাটা খুবই সহজ স্বরে বলা হ'লো, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেলো তার পিছনে কঠিন প্রচেষ্টা।

'বললাম তো,' অরুণার গলা প্রায় বুজে এলো, এটুকু বলতে।

'চিঠি একটা লিখলেই তো আর কিছু হ'য়ে গেলো না,' অশোক ক্ষীণ হাসলো। তারপর আরো স্পষ্ট ক'রে হেসে বললে: 'তুমি দেখছি মূর্তিমতী ট্র্যাজেডি হ'য়ে উঠলে এরই মধ্যে।'

পাৎলা একটু হাসি খেলা ক'রে গেলো অরুণার ঠোঁটে।

অশোকের মুখের উপর তার কালো চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি ঝলসে বললে : 'বলো, আরো বলো।'

'আমি তো কতক্ষণ ধ'রেই বলবার চেষ্টা করছি,' এবার সত্যি-সত্যি হালকা হ'লো অশোকের স্বর। 'অন্যের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়া ন্যায়সংগত নয়, তবে এবারের মতো তোমার এই ত্রুটি ক্ষমা করা যাচ্ছে। জানা রইলো, প্রস্তুত থাকবো।'

মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো অরুণা : 'কী ক'রে পারো! কী ক'রে পারো এমন হালকা সুরে কথা কইতে!'

'এখন যদি হালকা হ'তে না পারি তাহ'লে ম'রে যাবো যে। শোনো : আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত সব প্রস্তুত রইলো, কোনটা ঠিক সময় তার একটা নোটিশ দিতে ভুলো না।'

হঠাৎ, অকারণে, অশোকের মনটা ফুর্তিতে উপচে পড়ছিলো যেন। সর্বনাশের মুখে এমনি হয় বুঝি। নেশার মতো লাগে। কেননা ভয় পেতে আরম্ভ করলে ভয়ের শেষ নেই, কাঁদতে আরম্ভ করলে কান্না শেষ হবে গিয়ে আত্মবিলোপে। বিপদের মুখে যে-উত্তেজনার উল্লাস, যৌবনের রক্তে আছে তার সুর। যৌবনই জানে হতাশার বুকে বুক চেপে কেঁদে মরতে : যৌবনই পারে উচ্চহাসির উদ্দাম পাখায় হতাশার পাতাল পার হ'য়ে যেতে।

'নাটক রয়েছে সাজানো, এবার পরদা উঠলেই হয়,' উপমা বদল ক'রে অশোক আবার বললো। 'তোমার পার্ট ঠিক মনে আছে তো, অরুণা?'

'কী বলছো তুমি? কী ভাবছো তুমি?' অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায় অরুণা ব'লে উঠলো।

'তুমি যা ভাবছো, আমিও তা-ই ভাবছি। তুমি বলতে পারছো না, আমি বলছি।'

'সত্যি-সত্যি—?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তুমি বোঝো না, তুমি জানো না?'

আর হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো অশোক অরুণার চোখে। সেই ছায়া-ভরা আলোয় এমন সুন্দর সে দেখলো অশোককে, যেমন আর কখনো ছাখেনি। মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

'ভয় করে তোমার?' কানে-কানে বলার মতো মৃদু স্বরে অশোক বললে।

'যদি বলি করে, তবে কি খুব রাগ করবে?'

'ভয় কোরো না, কোনো ভয় নেই।' অশোক আস্তে অরুণার করতল একটু স্পর্শ করলে, থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা।

'অবাক লাগে আমার,' অরুণা যেন একটা মূর্ছার ভিতর থেকে বলতে লাগলো। 'কোথায় পাও তুমি এই সাহস, কোথায় পাও এই শক্তি?'

'কোথায় পাই!' অশোক তার ঘন-চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালিয়ে দিলে। 'পাই ঐখানে, তোমার ঐ নরম ছোটো-ছোটো আঙুলের আগুনের শিখায়। তুমি যাকে বলছো সাহস আর শক্তি, এ কি আমার! পাগল, এত জোর কি আছে আমার মধ্যে!'

'তবে?' রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলো অরুণা।

'সেই তো আশ্চর্য। কী জাদু আছে তোমার হাতে, তোমার চোখে, তোমার কথায়—তা কি তুমি নিজেই জানো! তোমার ঐ হাত যেন যুদ্ধের নিশান—তার ডাকে আমি যা পারি, তা কি পারি আর-কিছুর জন্য!'

অরুণা কিছু বললে না, এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন পলক পড়ে না। আর অশোক বলতে লাগলো :

'পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়েছো তোমরাই—তোমরা মেয়েরা। দুঃসাহসের রাস্তা খুলে দিয়েছো তোমরাই তো। পুরুষ তোমাদেরই হাতের সৃষ্টি—তোমাদেরই বাঁকা চোখের স্বপ্নের আকাশে পুরুষ নির্মাণ করেছে তার কীর্তির রূপকথা। তোমরাই ঘরছাড়া করেছো পুরুষকে—এগিয়ে দিয়েছো কালো চুলের ঠেলা দিয়ে সর্বনাশের পথে।'

ধ্বক ক'রে উঠলো অরুণার বুকের মধ্যে। কাঁপা গলায় বললে, 'না, না, অমন কথা বোলো না।'

অশোক ক্ষীণ হেসে কপালের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলে।—'পাগল! আমাকে দিয়ে কোনো ভয় নেই তোমার। সে আলাদা জাতের মানুষ—যারা সর্বস্ব পণ করে অনায়াসে, মরতে-মরতেও যাদের জেদ মরে না। অরুণা, তাদের হার হয়, তারা মরে—কিন্তু তাদের হাজার হারের উপরেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসে এ-ই তো দেখে এলাম। তোমার ভয় নেই—তোমার এই অশোক সেন সে-জাতের মানুষ নয়। সে বীর নয়, সে যোদ্ধা নয়, সে কবি নয়, অতি সাধারণ মানুষ সে।—তবু ঈশ্বর তাকে আজ অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন তার পৌরুষ প্রমাণ করবার। সে-সুযোগ সে হারাবে না।' শেষের কথাটা অশোক বললে ভীরু ছোটো গলায়, চুপে-চুপে।

ছায়া আরো ঘনিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, ভালো ক'রে মুখ দেখা যায় না। অরুণা নতমুখে ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে, তার বুকের রক্তে হাজার সমুদ্রের তোলপাড়।

একটু পরে অশোক বললে, খুবই সহজভাবে: 'তা তোমার একান্ত অমতে তোমার মা-বাবাই কি কিছু হ'তে দেবেন?'

'চিঠি থেকে তো মনে হ'লো,' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেলো অরুণার, 'মনে হ'লো—যেন সবই প্রায় ঠিক।'

'তোমাকে একবার জিগেস করবেন তো?'

'আমাকে জিগেস করবার আবার দরকার কী? আমি ছেলে-মানুষ—তার উপর মেয়ে—আমি কি নিজের ভালো-মন্দ কিছু বুঝি?'

'তাই ব'লে জোর ক'রে তো আর বিয়ে দিতে পারেন না।'

'পারেন না, না? পারেন না?' অরুণা প্রশ্নভরা ব্যাকুল চোখ তুলে অশোকের দিকে তাকালো। 'কী হবে, কী উপায় হবে আমার?' বলতে-বলতে অরুণার ছু-চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়লো। চোখের জল লুকোতে চাইলো না সে, তাকিয়ে রইলো অসহায় সমর্পণের ছবির মতো।

'কাঁদছো কেন?' বললে অশোক, 'কেঁদে কী হবে?'

'কেন এমন হ'লো? কেন আমার দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে? কেন আমি নিজে ডেকে আনলাম নিজের সর্বনাশ? এখন আমার কী উপায় হবে, এখন কী উপায় হবে আমার?' অরুণা ছু-হাত মোচড়াতে লাগলো, যেন শরীরের যন্ত্রণায়, আর তপ্ত দ্রুত অশ্রুস্রোত নেমে এলো তার গালের উপর দিয়ে।

আর অশোকের মনে হ'লো যেন নিশান লাফিয়ে উঠেছে আকাশে, বাতাসে ভেসে এসেছে ডাক, আর দেরি নেই। আর অরুণার অশ্রুস্রোত মুহূর্তে একটা রুপোলি তলোয়ার হ'য়ে উঠে তাকে মারলো।

'কেঁদো না,' একটা অসহ্য ব্যথার ভিতর থেকে সে ব'লে উঠলো, 'চলো তোমাকে কালই বিয়ে করি।'

ছু-হাতে মুখ ঢেকে তীব্র ভঙ্গিতে মাথা ঝেঁকে উঠলো অরুণা: 'না, না, তুমি যাও, এখনই যাও তুমি—এখানেই শেষ হোক।'

'শেষের কথা কী বলছো, এই তো আরম্ভ হ'লো। পারবে না তুমি স্পষ্ট ক'রে তোমার মা-বাবাকে বলতে—পারবে না ?'

অরুণার সমস্ত শরীর থরথর ক'রে একবার কেঁপে উঠলো, যেন জ্বরের ঘোরে। ব'লে উঠলো কান্নায় ভাঙা-ভাঙা গলায়: 'তুমি যে আলাদা জাত !'

'তা জানি। তবু তো এতে সন্দেহ নেই যে তোমাকে আমাকে মিলতেই হবে। তোমার বয়স আঠারো হয়েছে তো ?'

'কেন, এ-কথা জিগেস করছো কেন ?'

'যা ভয় করছো তা-ই যদি হয়, যদি আর উপায় না-ই থাকে···তাহ'লে শেষ উপায় যা আছে তা-ই করতে হবে।'

'কী সেটা ?'

'পালিয়ে যেতে হবে,' আশ্চর্য লঘুতার ঢঙে বললে অশোক।

'পালিয়ে !' সঙ্গে-সঙ্গে বংশানুক্রমিক অনতিক্রম্য সংস্কারের ধাক্কায় নীল হ'য়ে গেলো অরুণার মুখ।

'শেষ উপায় সেটাই তো। তারপর রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে হবে।'

'তারপর ?'

'তারপর ··And they lived happily ever afterwards. রূপকথার সব-শেষের পাতা।'

'আর আমাকে কী ছাড়তে হবে এই বাড়ি—বাবা-মা ভাই-বোন—এই সমস্ত-কিছু, জন্ম থেকে যার সঙ্গে আমি জড়িত—ছাড়তে হবে এই সব ?'

'ছাড়তে হবে, সব ছাড়তে হবে—যদি দরকার হয়।'

'আর··তুমি—তোমার কী দশা হবে। এর পিছে-পিছে আসবে দুঃখ, আসবে অভাব···সে যে কত ভয়ানক তা কি তুমি বুঝতে পারছো ?'

অশোক ম্লান হাসলো।

'আমি ও-সব ভেবে রেখেছি অনেক আগেই।'

'সব কি ভেবেছো? মানুষের মুখ হাঙরের মতো হাঁ ক'রে তোমাকে গিলতে আসবে তা কি ভেবেছো? হয়তো খাওয়া জুটবে না, হয়তো আদালত পর্যন্ত গড়াবে—তা ভেবেছো?'

'সব ভেবেছি। আমার নিজের মন আমি নিঃসংশয়েই জানি, তুমি তোমার মন জানো কিনা সেটাই এখন কথা।'

'আমি! আমি···কী? এই তো আমি তোমার জীবন ছারখার ক'রে দিতে চলেছি—এমন সুন্দর জীবন তোমার। এত বড়ো দুর্ভাগা আমি, তোমার স্বচ্ছন্দ শান্তির জীবনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর, দুঃখ যখন অসহ্য হবে, আমাকেই কি তুমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করবে না? তখন আমি কী করবো? তখন আমি মরবো কেমন ক'রে?'

'হায় রে, কেবল আমার দুঃখের কথাই বলছো কেন? যতই ভয়াবহ হোক, সে-দুঃখ তো তোমারও! তুমি কি দুঃখ পেয়ে আমাকে ঘৃণা করবে? পৃথিবীতে এমন কি কোনো দুঃখ আছে, যা তুমি-আমি একসঙ্গে সইতে না পারবো? আর-কিছু ভেবো না, আর-কিছু বোলো না: এই শুধু মনে-মনে বলো যে তোমাকে-আমাকে পরস্পরের কাছ থেকে কেউ যেন কেড়ে নিতে না পারে। সেটা দুঃখের কারণ হবে না, সেটা হবে ধ্বংস।'

'হয় তোমাকে দুঃখ দেবো, নয় তোমাকে ধ্বংস করবো—এই আমার কপালে ছিলো!' অরুণার কথার সুরে বেজে উঠলো চরম হতাশা।

'আমার জন্যই তোমার এত করুণা,' উচ্চস্বরে ব'লে উঠলো অশোক, 'যেন এতে তোমার নিজের কিছু নেই। দুঃখ পেতে

হ'লে তুমিও পাবে যে, ধ্বংস হ'তে হ'লে তুমিও হবে। আমি তো তোমার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলি না একবারও। দুঃখ তুমি যেন না পাও, এমন মূঢ় প্রার্থনাও করি না কখনো। অরুণা, এই পৃথিবীতে দুঃখের হাত থেকে আমরা কে কাকে বাঁচাতে পারি। আমি তোমাকে বলছি, অরুণা, আমার সঙ্গে এসে দুঃখ পাবে তুমি, হাজার দুঃখ পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাবে জীবনের পরিপূর্ণতা।'

'কী বলছো তুমি। আমার সুখদুঃখের কথা আমি কি কখনো ভাবি? তুমি কি মনে করো আমি সুখের কাঙাল? কিন্তু,' হঠাৎ অদ্ভুত নিবিড় স্বরে অরুণা ব'লে উঠলো, 'বাবা কী মনে করবেন, মা কী ভাববেন আমাকে। কত কাঁদবেন মা···কী ভীষণ লাগবে তাঁদের মনে।'

'এই তো।' অশোক এতক্ষণ ব'সে ছিলো, হঠাৎ সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। 'এই তো, এবার বেরিয়ে এলো আসল মানুষ, আসল অরুণা রায়। দেখা গেলো, তার মনে সংস্কারের সাপ এতক্ষণ বিঁড়ে পাকিয়ে লুকিয়ে ছিলো, এইবার সময় বুঝে গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে ফুঁশে উঠেছে।'

'পায়ে পড়ি তোমার, অমন নিষ্ঠুরের মতো বোলো না। তুমিই বলো, মা-বাবাকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে যাওয়া কি এতই সোজা।'

'আমাকে জিগেস কোরো না, মা-বাবার বিষয়ে কিছু জানি না আমি। তবে এটা তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন যে এ-দুর্ঘটনা নিবারণ করা তোমার মা-বাবারই হাতের মধ্যে আছে। আমরাও তো তা-ই চাই, আমরাও চাই যে সবই সহজ হোক। যদি তাঁরা তা না-ই হ'তে দেন, তাহ'লে বাধ্য হ'য়েই আমাদের বাঁকা পথ নিতে হবে। সে-জন্য দায়ী হবেন তাঁরাই। তুমি যে পায়ের নিচে

মাড়িয়ে যাওয়ার কথা বললে, সে তো তাঁরাই ডেকে আনবেন নিজেদের উপর!'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো অরুণার। 'কেন হয় এ-রকম, কেন হয়? কেন হয় ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব?'

অশোক রাস্তার দিকের জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো একবার, ফিরে এসে অরুণার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

'সুন্দর ব'লেছো কথাটা। এখন আমি তোমাকে খুব সহজ একটা প্রশ্ন করবো, ভালো ক'রে ভেবে উত্তর দিয়ো। তুমি কি আমাকেই চাও, না তোমার মা-বাবাকে?'

অরুণা বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে রইলো মূঢ়ের মতো।

অশোকের ম্লান-নিবিড় মুখের একটি পেশীও কুঞ্চিত হ'লো না। স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে বললে: 'বলো, এখন সময় হয়েছে মনস্থির করবার। তুমি কি আমাকেই চাও, না তোমার মা-বাবাকে?'

'তোমাকেই—তোমাকেই চাই,' সম্মোহিতের মতো ব'লে উঠলো অরুণা।

সঙ্গে-সঙ্গে অশোকের মুখের ভাব শিথিল হ'লো। মুখ নিচু ক'রে বললে: 'তাহ'লে তোমার মাকে বলি গিয়ে। না কি, তুমিই আগে বলবে?'

'আমিই বলবো,' অরুণা শান্তভাবে বললে। আর তার দিকে তাকিয়ে অশোক হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে কখন অজান্তে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে সে—দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত বালিকা হ'য়ে উঠেছে সম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর নারী। আশ্চর্য লাগলো তার মনে-মনে; মনে হ'লো এই সে অরুণাকে প্রথম জানলো।

অশোক বসলো তার পাশে, হাতখানা তুলে নিলো নিজের হাতের মধ্যে।—'তুমিই বলবে?'

অরুণা হাত ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টা না-ক'রে বললে: 'আমিই বলবো।'

'হয়তো সহজেই হ'য়ে যাবে,' বললে অশোক।

'হয়তো,' প্রতিধ্বনি করলে করুণা।

'তাঁরা তো তোমার বিয়ে দিতেই ব্যস্ত, আর এ-রকম বিয়ে তো কতই হচ্ছে আজকাল!'

'তা তো হচ্ছেই।'

'আর যদি এমন হয় যে তাঁরা···বিমুখ হলেন, তাহ'লে···খুব কষ্ট হবে তোমার এই সমস্ত···ছাড়তে ··ছেড়ে যেতে?'

'কষ্ট হবে না!' অরুণা তার সরল উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরলো অশোকের দিকে। আর সে-চোখের দিকে তাকিয়ে অশোকের হৃৎপিণ্ড ব্যথায় মুচড়িয়ে উঠলো, সব কথা গেলো হারিয়ে।

'তুমি কিছু ভেবো না,' অরুণা আস্তে অশোকের হাতে একটু চাপ দিলে। 'আমি মেয়ে, তোমাকে আমি কথা দিয়েছি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

তারপর ছু-জনেই ব'সে রইলো চুপচাপ, হাতে হাত রেখে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, ঘরের মধ্যে নিঃশব্দ হাওয়ার ঢেউয়ের ওঠা-পড়া। এমন সময় হঠাৎ পাৎলা স্যাণ্ডেল পায়ে সুমন্ত্র সে-ঘরে ঢুকলো, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো দরজার কাছে।

এক মুহূর্তের নিবিড় স্তব্ধতা, তারপর অশোক উঠে গিয়ে সুইচ টিপলো। হঠাৎ তীব্র আলোর ধাক্কায় অরুণা চোখ ঢাকলো ছু-হাতে।

সুমন্ত্র ঈষৎ হেসে বললে, 'ছঃখিত। তোর কাছে টুর্গেনিভের একটা গল্পের বই দেখেছিলাম, অরুণা, তা-ই নিতে এসেছিলাম।'

অশোক বললে, 'বই এখন থাক। চলো, সুমন্ত্র, তোমার ঘরে। কথা আছে।'

দুই ঢেউ, এক নদী

সেদিন রবিবার। সকালবেলার চায়ের পরে অরুণা তার দোতলার ঘরে গিয়ে একটা শেলাই নিয়ে বসেছিলো। শেলাইটা উপলক্ষ্য-মাত্র; একেবারে খালি হাতে চুপচাপ ব'সে থাকলে ভালো দেখায় না। আসল উদ্দেশ্য একা থাকা, নির্জনে থাকা, চুপ ক'রে ব'সে থাকা। অশোকের সঙ্গে তার ও-সব কথাবার্তা হয়েছে আজ পাঁচদিন হ'লো। এর মধ্যে অশোক বার দুই এসেছে, কিন্তু অরুণার সঙ্গে একা দেখা হয়নি। অরুণাই গেছে এড়িয়ে। আর-কিছু নেই। আর-কিছু বলবার নেই। এ-ক'দিনে অরুণা যেন নিজের গভীরতম সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে; বাইরে থেকে নিজের সমস্তটা গুটিয়ে এনে বাসা নিয়েছে নিজের মধ্যে। এ-ক'দিন সে কাটিয়েছে খুব বেশি একা, কারো সঙ্গে বড়ো-একটা কথা বলেনি, পালিয়ে এসেছে অলক্ষিতে পারিবারিক সঙ্গ থেকে। নানা কাজ ও ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত, হৃষীকেশবাবু কি বিজয়া কিছু লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য করেছে সুমন্ত্র, আর অরুণা টের পেয়েছে যে সুমন্ত্র লক্ষ্য করেছে। দাদার সঙ্গে দেখা হ'লে সে চোখ নামিয়ে নেয়নি, চোখ তুলে সোজা তাকিয়েছে, তারপর শান্তভাবে চ'লে গেছে অন্যদিকে।

সে শুধু চেয়েছে একা থাকতে, চেয়েছে একা ব'সে চুপ ক'রে ভাবতে। এ-ক'দিন সে কেবল ভেবেছে দিনে-রাত্রে, আর-কিছু করেনি। কী ভেবেছে? সে জানে না। চলতে-চলতে যেন তার পথের সামনে জ্ব'লে উঠেছে পুঞ্জ-পুঞ্জ আগুন, নেমে এসেছে আকাশ-জোড়া মেঘ, যেন লাল আগুনের মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরেছে

চারদিক থেকে, সারা পৃথিবী আড়াল ক'রে দিয়ে। চাপা প'ড়ে গেছে সে, এই বৃহৎ বাস্তবের জগৎ থেকে সে আজ লুকোনো। তার মনের সুড়ঙ্গ-অন্ধকারে দিন-রাত চলেছে চাপা গুমরোনি, যেন অনেক দূরের আকাশ থেকে-থেকে মেঘের আওয়াজে কথা ক'য়ে উঠছে। খেতে ব'সে সে খায় কি না খায়, রাত্রে ঘুমোতে পারে না, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে কাঁদে। ক-দিনে রীতিমতো খারাপ হ'য়ে গেলো তার চেহারা। এবং এটা নিশ্চয়ই বিজয়ার চোখে পড়তো, যদি-না তারই বিয়ের কথাবার্তায় তাঁর মনটা অস্বাভাবিকরকম ব্যাপৃত থাকতো।

সেদিন সকালে সে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলো, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ থোকা-থোকা ফুলের লাল মেঘে আকাশকে লেপে দিয়েছে। আর হঠাৎ তার মনটা ব্যথিয়ে উঠলো—অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা। এ যেন আর সে সইতে পারছে না, এই অবরোধ, গোপন সুড়ঙ্গের এই গুমরোনি,—ভাঙুক দরজা, ঝড় উঠুক—নামুক আকাশ-বাতাসের উদ্দাম নৃত্য তার বুকের মধ্যে। সেই বিশাল ভয়াবহ মুক্তির মধ্যে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

মনটাকে শান্ত করার চেষ্টায় সে চোখ নিচু ক'রে শেলাইয়ে ফোঁড় তুলতে যাবে, এমন সময় হুড়দাড় ক'রে পিন্টু ঢুকলো সে-ঘরে। হাতে তার লুডো খেলার সরঞ্জাম। অরুণার কাঁধের উপর অকারণেই একটা চড় মেরে বললে :

'দিদি, এসো লুডো খেলি।'

তারপর, দিদির সম্মতির অপেক্ষা না-ক'রেই লুডোর ছক পেতে ব'সে গেলো মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে। কাঠের চোঙার মধ্যে ঘুঁটিটা সশব্দে নাড়তে-নাড়তে বললে : 'এসো, এসো শিগগির।'

ছেলেটার জ্বলজ্বলে মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বড়ো মায়া

হ'লো। আস্তে বললে : 'পিন্টু, এত কী তুই লুডো খেলতে ভালোবাসিস।'

'ওঃ, এসো, এসো, ছাখো কেমন তোমাকে হারিয়ে দিই দশ মিনিটে। আমার কিন্তু লাল।'

'আমার সঙ্গে খেলে তোর তো ভালো লাগবে না—আমি তো আগে থেকেই হেরে আছি।'

নিজের হাঁটুতে চড় মেরে চীৎকার ক'রে উঠলো পিন্টু, 'খেলবে কিনা তা-ই বলো!'

অরুণা উঠে গিয়ে টান দিলে তার টেবিলের ছোটো দেরাজে। চুলের কাঁটা-ফিতে, বন্ধুকে লেখা অসমাপ্ত চিঠি, চকোলেটের মোড়ক ইত্যাদির মাঝখানে কপালগুণে একটি দু-আনি পাওয়া গেলো। সেটি হাতের তেলোয় রেখে পিন্টুর সামনে হাত মেলে ধ'রে বললে, 'এই নে।'

পিন্টু তাকালো সেই লোভনীয় মুদ্রার দিকে, তারপর তাকালো দিদির মুখে, এই আশাতীত বদান্যতার পিছনে কোনো গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা, বোধহয় তা-ই আঁচ করতে।

অরুণা বললে : 'নে এটা, তারপর ভাগ, এক্কেবারে এক ছুটে পল্টুদের বাড়িতে। পল্টুকে হারাতে পারিস তবে বুঝি।'

'ইশ, পল্টুকে কতদিন হারিয়েছি না, জিগেস ক'রে দেখো। তা ওর সঙ্গে আমি তো আর খেলবো না।'

'ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?'

'করেছি, বেশ করেছি। ও একটা ইষ্টুপিট, ফুল্—দেখতে পারিনে দু-চক্ষে।'

'এই তো সেদিন কত ভাব দেখলুম।'

'তুমি খেলবে না আমার সঙ্গে?' গজরাতে-গজরাতে পিণ্টু বললে: 'খেলবে না তো?'

'পিণ্টু, শোন—'

অরুণা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাচ্ছিলো, পিণ্টু একলাফে গেলো স'রে।—'যাও, যাও—ভেবেছো কী তুমি, আমি একাই বেশ খেলতে পারবো—যাওঃ!' বলতে-বলতে, ফুঁশতে-ফুঁশতে ছিটকে বেরিয়ে গেলো বারান্দায়। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বললো, 'কই, পয়সা দেবো ব'লে তারপর বুঝি আর দিতে হয় না!'

অরুণা একটু হেসে বললে: 'নিলেই তো হয়।'

ছোঁ মেরে দু-আনি তুলে নিয়ে পিণ্টু বারান্দায় গিয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে পড়লো মেঝেতে; লুডোর ঘর পেতে খেলতে ব'সে গেলো মনে-মনে শত্রুপক্ষ সাজিয়ে।

টুনকি এসে খবর দিলে: 'দিদি, মা তোমাকে নিচে ডাকছেন।'

নিচে যেতে একটুও ইচ্ছা করছিলো না অরুণার। জিগেস করলে, 'কেন রে?'

টুনকি ঘাড়ের কাছে থোবা-থোবা চুল দুলিয়ে বললে, 'তা তো জানিনে।'

'কেউ এসেছে নিচে?'

'কাপড়ের ফেরিওলা এসেছে।'

ও, তাই। কোনো শাড়ি কি ব্লাউজপীস পছন্দ করতেই মা তাকে ডাকছেন বোধহয়। আজকাল তার কাপড়চোপড়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে মা বড়ো বেশি সচেতন। প্রয়োজন—কিন্তু পঞ্চাশটা জামা আর চৌত্রিশটা শাড়িতে কি মানুষের প্রয়োজন? তবু মা ফেরিওলা দেখলেই আর ছাড়েন না—অরুণাকে ডেকে এটা নিবি, ওটা নিবি, অরুণা চুপ ক'রেই থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু-না-কিছু রাখাই হয়।

একবার বছরখানেক আগে অরুণা যখন দু-টাকা দামের একখানা নীল রঙের ময়নামতীর শাড়ি কিনতে চেয়েছিলো, এই মা-ই বলেছিলেন :

'চাইতে শিখলে কবে? তোমাদের যা দরকার তা তো না-চাইতেই পাও।'

সেদিন অরুণা যে-লজ্জা পেয়েছিলো তার তুলনা হয় না। ঘোরতর লজ্জা এই কারণে যে—সত্যি সে মুখ ফুটে কখনো কিছু চায় না, হঠাৎ একটা খুশির ঝোঁকে সেই একবার চেয়েছিলো। এবং মার কথায় তার যে আত্মশুদ্ধি হয়েছিলো তার জন্য সে কৃতজ্ঞই বোধ করেছে মনে-মনে: কিছু চাইতে হয় না—এ-কথা জীবনেও সে ভুলবে না।

আর সেই মা আজ তাকে নানা রঙের নানা রকমের জামাকাপড় কেনার জন্য প্রতিদিন পিড়াপিড়ি করেন। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে অবিশ্যি। এ তার বিয়ের আয়োজন। নয়তো তাদের অবস্থা হঠাৎ এমন-কিছু ফেঁপে ওঠেনি যে যত খুশি যেমন খুশি জামা-কাপড় তার জন্য মঞ্জুর হ'তে পারে। বরং, সে যতদূর জানে, বাবার অবস্থা এখন পড়তিরই দিকে। এবং তার বিয়ে সম্বন্ধে এত ব্যাকুলতাও সেইজন্যেই।

কাপড়গুলো এসেছে—তাকে নিচে যেতে হবে। হঠাৎ একটা বিতৃষ্ণায় তার শরীর সংকুচিত হ'য়ে উঠলো। সেই অনুভূতি যেন শারীরিক ন্যক্কারের মতো।

'কই, যাচ্ছো না?' আবার বললে টুনকি।

অরুণা কিছু বললে না; কথাটা বোধহয় তার কানেও যায়নি।

টুনকি হঠাৎ অরুণার গা বেঁষে দাঁড়িয়ে চুপি-চুপি বললে: 'দিদি, তোমার বিয়ে হবে?'

এ-কথাটা শুনে টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো অরুণার মুখ। রাগের চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'টুনকি!'

ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে টুনকি দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।

'সারাদিন ঘুরে-ঘুরে বড়োদের কথা গিলিস—আর নিজের মাথাটি চিবিয়ে খাস, না?'

টুনকি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গিয়ে বললে: 'আমি কী বলেছি, আমি তো শুধু—' টুনকির প্রায় আটকে এলো।

'এ-সব কথা কক্ষনো আর বলবি না।'

'না, আর বলবো না।'

টুনকি মাথা ঝাঁকালো, ছুলে উঠলো তার ঝাঁকড়া কালো এলোমেলো চুল। অরুণা দেখলো, মেয়েটা বুঝি কেঁদেই ফেলে। তাড়াতাড়ি ওর কালো কুচকুচে মাথাটা টেনে নিলো বুকের কাছে। ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো টুনকি।

ওর চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে অরুণা বললে: 'কেন বললি? জানিসনে, বড়োদের কথা ছোটোদের বলতে নেই।'

ছু-হাতে চোখ চেপে ধ'রে টুনকি আরো একটু কাঁদলো, তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে ঝকঝকে চোখে তাকালো দিদির মুখের দিকে। কান্না থেমেছে, লেগে রয়েছে চোখের কোণে কালো-কালো দাগ।

আর ঐ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলো অরুণার বুকের ভিতরটা। এ-বাড়ির মধ্যে এই ছোটো মেয়েটাই কেমন যেন আলাদা, যেন অন্য রকম। বেশির ভাগ সে থাকে একা, নিজের মনে; অন্যদের কাছে যখন ঘেঁষে, এমন একটি কুণ্ঠা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে, শিশুর মধ্যে যেটা স্বাভাবিক নয় একেবারেই। সে যেন সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে কেউ কিছু বলবে এই আশায়। কিন্তু বিশেষ-কিছু কেউ

বলে না, তাকে আমলেই আনে না কেউ, সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। শুধু বাবা মাঝে-মাঝে কাছে ডাকেন, তখন তার জীবন যেন ধন্য হ'য়ে যায়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তার শিশুমনের সমস্ত পূজা সে দিয়েছে তার বাবাকেই; তার বাবা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তার বাবা তার অস্পষ্ট কল্পনার ঈশ্বরের মতো। তাদের পরিবারে শিশুদের সামনে নানা বিষয়ে আলোচনায় বাধা নেই—টুনকি হয়তো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব শোনে। কিছু কি বোঝে? কিছু কি বোঝে না? শিশুদের যতটা ছেলেমানুষ আমরা মনে করি, ততটা ছেলে-মানুষ তারা হয়তো নয়। আর্থিক টানাটানির সঙ্গে-সঙ্গে পরিবারে নানা রকম দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেয়; এই মেয়েটার মনে হয়তো আছে সে-সমস্তেরই অনুভূতি। গোপন মনে-মনে. সবই হয়তো সে বুঝবে—বাবার অভাব, দাদার অমিতব্যয়িতা, দিদির বিয়ের সমস্যা। তাই তো—তার মুখের ভাবটাই একটু অন্য রকম। সে যে সব বুঝছে সেটা তো তাকে গোপন করতে হচ্ছে সব সময়—সেইজন্যই কি তার অমন কুণ্ঠা? মেয়েরা কি কিছু এই রকমেরই হয়? পিণ্টু তো ওর তিন বছরের বড়ো, কিন্তু ও মেতে আছে ওর লুডো-ক্যারম-সিনেমার শিশু-স্বর্গে, ওর দাবরাবে আবদারে অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ। যত অসংখ্য বিচিত্র প্রয়োজন তার জীবনের, কোনো রহস্যময় ভাণ্ডার থেকে তার অফুরন্ত জোগান আসবেই, এই অন্ধ বিশ্বাসে সে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক। খেপে ওঠে সে, সেই বিশ্বাসে এতটুকু ঘা লাগলে। বাড়ির সঙ্গে তার শুধু সেই রসদ-জোগানের সম্পর্ক, তার জীবনটা তো বাইরের বহুল বিচিত্রতায় ছড়ানো ছিটোনো। ও-রকম কি হ'তে পারে মেয়েরা? মেয়েরা কিছু আলাদাই হয়—নিজেকে দিয়েই সে তা বুঝতে পারে। শিশুকাল থেকে মেয়েরা থাকে ঘরে, ঘরের মধ্যেই তাদের

সব খেলা আর খেয়াল ; সব তারা শোনে, সব তারা ছাখে, কিছু-কিছু হয়তো বোঝে। এই নির্জন মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে টুনকি নিশ্চয়ই চেয়েছিলো কোনো মনের কথা বলতে—নয়তো কোনো অসংগত কি উদ্ধত মন্তব্য করবার মতো মেয়ে তো সে নয়।

'কোথায় শুনলি রে, আমার যে বিয়ে হবে?' অরুণা বললে, মেয়েটার জলে ভরা চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে।

টুনকি জবাব দিলে না। লজ্জা সে এমনিতেই খুব পেয়েছে, আর অপমান ক'রে কাজ নেই, এমনি তার মুখের ভাব।

'বল না কোথায় শুনলি।' অরুণা হাসলো, টুনকি যাতে সাহস পায়।

'সবাই—বলছে,' ক্ষীণ, অস্পষ্ট গলায় বললে টুনকি।

'সবাই বলছে—না?'

অরুণা আর-কিছু বললে না—নাকি, আর-কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো? কী বলবে সে এই শিশু-মেয়েকে—আর এই মেয়েই বা কী বলবে তার কথা উঠলে···এর পরে···আরো পরে?

হঠাৎ, যেন ভিতরকার কোনো অপ্রতিরোধ্য চাপে, টুনকি ব'লে উঠলো, 'তারপর তুমি তো আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে—না, দিদি?'

আর অরুণা নিজেও টের পেলো না কখন তার দু-চোখ জলে ভ'রে উঠলো। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট, একটানা ব্যথা, হৃৎপিণ্ডটা মুচড়িয়ে উঠছে যেন। টুনকির দিকে না-তাকিয়ে সে উঠে গেলো, দাঁড়ালো জানলার ধারে গিয়ে, যেখানে বিলম্বিত কৃষ্ণচূড়া আকাশকে লাল ক'রে দিয়েছে। নামলো কান্না।

'অরুণা, কোথায় রে—' বলতে বলতে বিজয়া ঘরে ঢুকলেন। হাতে তাঁর দু-খানা জর্জেটের শাড়ি, ভাবটা কিছু ব্যস্ত। 'অরুণা, আয় এদিকে, শোন।'

মার ডাক শোনামাত্র অরুণার কান্না নিজে থেকেই থেমে গেলো, যেন ভিতরকার কোনো যন্ত্রের কৌশলে; বাইরের দিকে তাকিয়ে অলক্ষিতে চোখ মুছে নিয়ে কাছে এলো সে।

'সেই ফেরিওলা এসেছে—কী সুন্দর জর্জেট এনেছে, ছাখ।'

অরুণা চুপ।

'সেই কখন থেকে ডাকছি তোকে। ছাখ, এ দুটো আমি পছন্দ ক'রে আনলাম, এর মধ্যে কোনটা রাখবি বল।'

'যেটা হয় রাখো,' অরুণা বললে, ধরা গলায়।

শাড়ির শোভা দেখতে বিজয়া এত ব্যস্ত যে মেয়ের মুখের দিকেও ভালো ক'রে তাকালেন না। কাপড় নিয়েই নাড়াচাড়া করতে-করতে বললেন, 'এই গোলাপি রঙেরটায় তোকে বেশ মানাবে—তাছাড়া, এ-রঙের শাড়ি তোর একটাও নেই।'

'বেশ, এটাই রাখো।'

'না কি এই ব্লু রঙেরটা রাখবি? সেদিন অনাদিবাবুর মেয়ে এই রঙের একটা শাড়ি প'রে এসেছিলো না? জরির চুমকিগুলো ঝলমল করে রাত্রে। গোলাপি রঙটায় ওগুলো বেশি খোলে না কিন্তু।'

অরুণা কিছু বলবার চেষ্টা করলো; বলবার মতো কিছু খুঁজে পেলো না।

দু-হাতে দুটো শাড়ি নাড়াচাড়া করতে-করতে বিজয়া বললেন: 'কাপড় দুটো বেশ কিন্তু—ছাখ। আর,' যদিও কাপড়ওলার

কথাটা শুনে ফেলবার সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিলো না, তবু তিনি গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'আর কী শস্তা। বারো টাকা চেয়েছিলো, আট টাকায় রাজি করিয়েছি। এ-কাপড়ই দোকানে ঝুলিয়ে রাখলে পনেরো টাকা।'

কিন্তু অরুণা কাপড়গুলো ছুঁয়েও দেখলো না, দূর থেকে শুকনো চোখে তাকিয়ে বললে : 'জাপানি বোধহয়।'

'হোক জাপানি—জাপানি তো আর গায়ে লেখা থাকে না। দেখতে-শুনতে বিলাতি জর্জেটের চেয়ে খারাপ নাকি? ফেরিওলা হ'য়ে কত সুবিধেই হয়েছে। নিজেরা দেখে-শুনে রাখা যায়, আর আদ্ধেক শস্তা তো পড়েই, তার উপর বাকিও রাখা যায়।'

রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন বিজয়া। দেখে কি মনে হয় না, কাপড়-চোপড় তিনি সত্যি-সত্যি ভালোবাসেন—কিন্তু নিজের জন্য নয়, মেয়ের জন্য। নিজের সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই নেই তাঁর। অরুণা কখনো তাঁকে ছাখেনি মিলের শাদা শাড়ি ছাড়া আর-কিছু পরতে। বড়ো জোর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কি বিশেষ-কোনো নিমন্ত্রণে যাবার সময় লাল-পেড়ে গরদ। আছে তাঁর বাক্স বোঝাই হ'য়ে তাঁর যৌবনের রং-খেলানো চোখ-ঝলসানো শাড়ির স্তূপ : মস্তর বৌয়ের জন্য সে-সব। যে-জর্জেট নিয়ে এখন তাঁর এত উৎসাহ, অরুণা যদি প্রস্তাব করে তার একখানা তাঁর গায়ে উঠবে তাহ'লে তিনি এত স্তম্ভিত হবেন যে সারাদিন বোধহয় আর ভালো ক'রে কথাই বলতে পাববেন না।

'তাহ'লে এই গোলাপিখানাই রাখি—উঁ?'

'রাখো।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা ক'রে বিজয়া বললেন : 'না কি দু-খানাই রেখে দেবো? দাম তো পরে দিলেও চলবে।'

অরুণা হঠাৎ নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে ব'লে উঠলো: 'না, না, কক্ষনো না। কক্ষনো তুমি দু-খানা রাখতে পারবে না, মা। এক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে এসো গে, যাও।'

বিজয়া একটু অবাক হ'য়েই মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। অরুণার উত্তেজনাটা একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গিয়েছিলো—সে নিজেও লজ্জিত হ'লো। একটু শান্তভাবে বললে, 'সত্যি মা, দু-খানা রেখে কী হবে!'

'আহা—বলেছিলুম ব'লেই আমি যেন দু-খানা রাখতে গিয়েছি। তুইও যেমন!' প্রত্যাখ্যাত শাড়িখানার উপর সস্নেহে শেষবার হাত বুলিয়ে তিনি সেখানা ভাঁজ ক'রে তুলে নিলেন। একটু থেমে বললেন, 'তুই স্নান করবি না?'

'করবো'খন—এখনই কী হয়েছে!'

'চল আজ তোর মাথা ঘ'ষে দিই। আমার হাত খালি আছে এখন—চল।'

'না, না—এখন না মা, আজ না। আজ কিছুতেই মাথা ঘষবো না আমি।'

'লক্ষ্মী তো, চল। নিজে তো ঘষবি না কখনো, অযত্ন ক'রে-ক'রে সুন্দর চুলগুলোর কী দশাই করেছিস!'

অরুণার চুলের যে খুব দুর্দশা, তা সে এই অবশ্য প্রথম শুনলো; আর তা ছাড়া মায়ের এই সস্নেহ সম্বোধনও আজ অদ্ভুত লাগলো তার। মাথা নেড়ে বললে, 'আজ ইচ্ছে করছে না একেবারেই। আর এই তো সেদিন মাথা ঘষলুম কলেজের নাটকের দিন।'

'ওঃ, সে কবেকার কথা! একমাসের বুঝি বেশিই হবে।'

'হোক। মাথা আবার লোকে রোজ-রোজ ঘষে নাকি।'

'আহা—আয় না আজ তোকে স্নান করিয়ে দিই নিজের হাতে ভালো ক'রে। সেই তো ঝুপঝুপ দু-ঘটি জল মাথায় ঢেলে কলেজে যাস, ওকে কি আর স্নান বলে! পায়ে বুঝি সাতজন্মের মাটি পড়েছে।'

হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ লুকোনো কালো সাপের মতো লাফিয়ে উঠলো অরুণার মনে, মুহূর্তে যেন পাথর হ'য়ে গেলো তার হৃৎপিণ্ড। বিজয়ার দিকে স্থির, গভীর দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না।

বিজয়া আবার ডাকলেন, 'এই, চল না।'

'না, আমি এখন স্নান করবো না, তুমি যাও,' ব'লে অরুণা গিয়ে টেবিলের ধারে তার চেয়ারে বসলো। তার কথার সুরে, তার চোখে-মুখে চলবার ধরনে এমন-কিছু ছিলো যাতে বিজয়া আর জোর করতে পারলেন না। ঘর থেকে চ'লে যেতে-যেতে নিচু গলায় শুধু বললেন :

'বাবাঃ—তোরা যে সব কী হচ্ছিস দিন-দিন, কিছু বললেই গায়ে ফোস্কা পড়ে।'

অরুণা চুপ ক'রে ব'সে রইলো, টেবিলের উপর দু-কনুই আর হাতের মধ্যে মাথা রেখে। তার শরীর যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। সে জানে, সে নিশ্চিত জানে; তার সেই ভয়ানক সন্দেহই যে সত্য, এক মুহূর্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে কেমন ক'রে সে তা বুঝে ফেলেছে। কথাটা একবার যখন মনে পড়লো, তখন আরো নানা-রকম প্রমাণ পেতে দেরি হ'লো না। সকাল থেকেই বাবা-মার মধ্যে একটা চাপা ব্যস্ততার ভাব। তাঁরা অবশ্য রোজই ব্যস্ত, সব সময়েই ব্যস্ত; কিন্তু আজকের ব্যস্ততাটা একটু অন্য রকম, তার মধ্যে একটু যেন দুশ্চিন্তার আমেজ। চায়ের সময়ে নিচু গলায়

একটু কথা দু-জনে, এ-রকম তো ওঁরা কত সময়েই বলেন, তখন অরুণা কিছু বোঝেনি। তারপর শাড়ি কেনা হ'লো, অঙ্গমার্জনা ও কেশসাধনার জন্য পিড়াপিড়ি, তারপর···তারপর। যে-চিঠিটা তার হাতে পড়েছিলো তাতে তো ও-কথা স্পষ্ট লেখাই ছিলো, যদিও তারিখ উল্লিখিত ছিলো না।

অরুণা দু-আঙুলে চোখ টিপে ধরলো। আর তার বোজা চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো জ্বলন্ত-নীল নরক। অতি শাদা কথায় বলতে গেলে এই: এক ভদ্রলোক তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব বিবেচনা করতে সম্মত; তিনি আজ বিকেলে সবান্ধবে তাদের বাড়িতে আসবেন, আর তাকে স্নানমার্জিত চিক্কণ দেহ নিয়ে গোলাপি রঙের জর্জেট প'রে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কথাটা কী ক'রে সে অমন নির্লজ্জ স্পষ্টতায় ভাবতে পারলে! তখনই অবাক লাগলো তার। প্রতিটি কথা কোনো পিচ্ছিল সমুদ্র-সরীসৃপ; চারদিক থেকে তাকে জড়াতে আসছে লিকলিক কিলবিল ক'রে। পারবে না, কিছুতেই পারবে না সে; ম'রে গেলেও পারবে না।

কিন্তু এই বা কেমন যে মা-বাবা আগে তাকে কিছু বলবেন না? যে-ঘটনা একশোতে সাতানব্বুই জন হিন্দু মেয়ের ভাগ্যেই হয়তো একাধিকবার ঘটে, এ-পর্যন্ত তার জীবনে সেটা ঘটেনি। ভাবেনি, কখনো ঘটতে পারে। এখন তার বয়স উনিশ। সে নেহাৎ অন্ধ, কুনো হ'য়ে নেই; সে একটু লিখতে-পড়তে পারে, একটু ভাবতে পারে, পৃথিবীর বৃহৎ জীবনের কল্লোল একটু তো লেগেছে তার কানে—তার ব্যবস্থা এই মা-বাবাই করেছেন। কী ক'রে তাঁরা ভাবতে পারলেন যে তার বয়সের ও পরিণত মনের মেয়েকে···একবার জিগেস পর্যন্ত করলেন না। ঠিক এমনি হয়তো

কত মা-বাবাই করছেন ঠিক তারই মতো কত মেয়েকে প্রতিদিন ঘরে-ঘরে। কিন্তু সে ভেবেছিলো তার মা-বাবা অন্য রকম। ভুল করেছিলো ভেবে। ও আমাদের মেয়ে, ওকে যা-ই করতে বলবো তা-ই করবে। হ'তো যদি সে হাড়ে-মাংসে জড়ানো একটা বস্তা… তাহ'লে কোনো ভাবনাই ছিলো না। তাহ'লে তাঁরা অনায়াসে পারতেন সেই বস্তাকে রংদার শাড়ি পরিয়ে চুল এলিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বিবাহেচ্ছু পুরুষের সামনে উদ্‌ঘাটন করতে। কিন্তু তা তো নয়: তার হৃদয় আছে, আছে স্বতন্ত্র অনুভূতি, তার বুদ্ধি আছে, আছে বিচারশক্তি, আছে রুচি আশা ইচ্ছা—এমনকি, অনিচ্ছাও আছে। সে মানুষ, সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা। এই অতি সহজ বৃহৎ কথাটা কী অনায়াসে তার মা-বাবা ভুলে গেলেন। আশ্চর্য, তাঁরা কি অন্ধ? প্রথা-অন্ধ তাঁরা, তাই এই অশ্লীল প্রথার সামনে মেয়ের চরম অপমানেই তাঁরা আজ উৎসুক। স্থূলবুদ্ধি দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রই তো হরণ করতে চেয়েছিলো, তাকে পণ্যের মতো সাজিয়ে সম্ভাব্য প্রভুর সামনে জাহির করাবার সূক্ষ্মতর ও দারুণতর অবমাননা তার মাথায় আসেনি। তবু তো শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বাঁচিয়েছিলেন: তাকে বাঁচাবে কে?

আর এদেশেই এককালে মেয়েরা হ'তো স্বয়ংবরা, পুরুষকে জয় করতে হ'তো স্ত্রী নিজের বীর্যের প্রমাণ দিয়ে। তখন প্রেম মানেই ছিলো বিবাহ; প্রেমই ছিলো মিলনের হেতু ও সমর্থন। তখনকার দুর্যোধন দুঃশাসনরাও এ-নীতিকে মর্যাদা দিয়েছে; রাবণ ডাকাত ছিলো, রাবণ ইতর ছিলো না। সেই দেশ আজ অন্ধ মূঢ় নির্বোধ নিষ্ঠুর, সেই দেশ মৃত প্রথাবদ্ধ ব্যভিচারে কলুষিত। প্রথা নীতির প্রতিচ্ছায়া; নীতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি। যে-অবস্থায় পুরোনো নীতি ও তার ফলরূপী প্রথা সম্ভব হয়েছিলো,

সে-অবস্থা একেবারেই বদলে গেছে; এখনকার অবস্থায় সে-সব প্রথা প্রয়োগ করাও যা, গলিত শব আঁকড়ে প'ড়ে থাকাও তা-ই। ন-বছরের বুদ্ধিহীন বালিকাকে কনে-দেখানো সম্ভব ছিলো, অসংগতও ছিলো না, কিন্তু যে-মেয়ে পূর্ণবয়স্কা, যে-মেয়ে দিনের আলোয় পৃথিবীকে দেখেছে, তাকে নিয়ে—ছী-ছী-ছি! অরুণার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ঘৃণার ঢেউ উত্তাল হ'য়ে উঠে মিলিয়ে গেলো।

এই প্রথা-পীড়িত দেশকে কোন কৃষ্ণ ত্রাণ করবে? কিন্তু একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত: নিজের উপর এই জবরদস্তি সে হ'তে দেবে না কিছুতেই: পারবে না, কিছুতেই পারবে না সে।

এমনি অরুণা ব'সে রইলো, বেলা বাড়লো। বেলা বাড়লো, বাইরে হাওয়া উঠলো তেতে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ আকাশে। নিচে থেকে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিনের জীবনের শব্দ: কলতলায় ঝি কাপড় কাচছে ছপছপ ক'রে, পিন্টু উঠোনে মার্বেল খেলছে, তার ঠোকাঠুকি; সাইকেলে ক'রে কে এলো ক্রিংক্রিং। কে এলো? হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো অরুণার হৃৎপিণ্ড। না, সে নয়, সে নয়। সে যেন আজ না আসে। কাটলো অনেকক্ষণ, কেউ এলো না তার ঘরে, বাঁচা গেলো।

বাঁচা গেলো, কেউ যেন আর না আসে তার ঘরে; কেউ যেন আজ না আসে তাকে বিরক্ত করতে। আজ সে একেবারে একা, একেবারে বিচ্ছিন্ন; চারদিকে জীবনের জল ছলছল ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে যেন চ'লে গেছে অনেক দূরে, বাড়ন্ত বেলার ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের ঐ আকাশে; সে আজ মূলহীন, ভিত্তিহীন, আসক্তিহীন, নিকট পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমস্ত যোগ এক মুহূর্তে তার কেমন ক'রে ছিঁড়ে গেলো; পালকের মতো হালকা লাগছে নিজেকে, পালকের মতো নিশ্চিন্ত, স্বাধীন, এই বিশাল

জ্বলন্ত আকাশের নিচে এই তপ্ত অবাধ হাওয়ায় একটুখানি পালকের মতো ভাসছে সে।

বেলা বাড়লো।

*

তারপর বিজয়া এলেন। এইমাত্র রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছেন, গায়ে ঈষৎ পেঁয়াজের গন্ধ।

'এ কী অরুণা, এখনো তুই এখানে ব'সে আছিস?'

'কী করবো?'

অরুণা চেয়ার ছেড়ে উঠলো না, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে মা-র দিকে তাকালো ঋজু সংহত দৃষ্টিতে।

'কী করবো! বাঃ, বেশ মানুষ তুই! নাইতে হবে না? খেতে হবে না?'

অরুণা কপালের উপর আস্তে হাত বুলিয়ে বললে: 'শরীরটা ভালো লাগছে না মোটেও।'

'ভালো লাগছে না!' বিজয়ার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আশঙ্কা যা নিছক মেয়ের স্বাস্থ্যহানির জন্য নয়।

'বোধহয় জ্বর হবে।'

'জ্বর হবে! বলিস কী! দেখি, দেখি,' বিজয়া তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়ের কপালে হাত রাখলেন। 'কই, না তো! অত বেলা ক'রে ঘুম থেকে উঠেছিস তাই গা-ম্যাজম্যাজ করছে। তখন বললুম, আয় স্নান করিয়ে দিই—শুনলি না তো! স্নান করলেই ভালো লাগতো।'

অরুণা নাড়ি টিপে ধ'রে বললে: 'একটু বোধহয় জ্বরই হয়েছে।'

'না, না, জ্বর না! স্নান ক'রে খেলেই সেরে যাবে। আজ শরীর খারাপ হ'লে উপায় আছে নাকি! আজ তোকে দেখতে আসবে যে!'

বিজয়া এত সহজে বললেন কথাটা, যেন কোনো বন্ধু বেড়াতে আসবে কি যেতে হবে কোনো সুখকর নিমন্ত্রণে।

অরুণার মুখে এতটুকু ভাবান্তর হ'লো না। শান্তভাবে বললে, 'সত্যি অসুখ করেছে আমার। শুয়ে থাকবো এখন।'

ব'লে সে চেয়ার ছেড়ে উঠেই দাঁড়ালো, যেন এখনই শুয়ে পড়বে।

বিজয়া চোখ কপালে তুলে বললেন: 'পাগল হলি নাকি তুই? আমি তোকে বলছি, কিছু হয়নি তোর। চারটের সময় ওরা আসবে—অবেলায় নেয়ে খেয়ে চেহারাটা দাঁড়কাকের মতো ক'রে না-রাখলে কি চলে না?'

অরুণা একবার গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে: 'তুমি এখন যাও, মা!'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয়া বুঝলেন। এ-রকম রঙ্গভঙ্গ আজকালকার মেয়েরা কখনো-কখনো ক'রে থাকে, তিনি শুনেছেন। এর প্রশ্রয় দিতে নেই। কঠিন গলায় বললেন: 'অরুণা, অবাধ্যতা কোরো না, বলছি। যাও, শিগগির স্নান ক'রে এসো—এক্ষুনি যাও।'

অরুণা বললে, 'স্নান আমি আজ করবো না।'

'ছ্যাখো অরুণা, তোমাদের অনেক আবদার অনেক অত্যাচার আমি স'য়ে আসছি সারা জীবন। এখন আর জ্বালিয়ো না—যাও। যা বলছি, তা-ই করো।'

'কী বলছো তুমি?' উদাসীনভাবে অরুণা বললে।

'কী বলছি কানে ঢুকছে না, মা? এ-রকম অসভ্যতা কোথায় শিখলি তুই? এমনিই তো সংসারের হাজার তাড়নায় আমার

হাড় থেকে মাংস আলাদা হ'য়ে গেলো—তার উপর তোদের এ-রকম অলক্ষ্মীপনা কি না-করলেই নয়? বলছি তোকে আজ দেখতে আসবে—তা মেয়ের যেন কানেই ঢুকছে না।'

'কে আসবে?'

'যেই আসুক, তোর তাতে কী? আসবে—ছেলে নিজেই আসবে। কী বেহায়া বাবা তোরা আজকাল মেয়েরা! ওরে, এখন তো কত রকমই করবি—তারপর, প্রজাপতির দয়ায় যদি হ'য়ে যায়, দু-দিন পরে তো আমাদের কথা মনেও পড়বে না।'

অরুণা একটু চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললে, 'ওঁদের একটা খবর পাঠিয়ে দাও বরং।'

'খবর—কাদের?'

'যাঁদের আসবার কথা। ব'লে পাঠাও, না যেন আসেন।'

বজ্রাহতের মতো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিজয়া।

'কী বললি?'

'বললুম ওঁরা যেন আজ না আসেন।'

বিজয়া ভালোমতো নিশ্বাস নিতে না-পেরে কয়েকবার ঢোঁক গিললেন।

অরুণা আবার বললে, 'আমি ওঁদের সামনে যেতে পারবো না—আমার শরীর খুব খারাপ।'

হঠাৎ কোনো গূঢ় প্রবৃত্তির পরিচালনায়, বিজয়া দ্রুত পা ফেলে একেবারে মেয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, তারপর তেমনি তাড়াতাড়ি পিছনে হেঁটে আগের চেয়েও দূরে স'রে গেলেন!

'এই—এই তোর মনে ছিলো!' অপ্রকৃতিস্থ বিলাপের মতো বিজয়া বলতে লাগলেন: 'ওরে হতভাগা মেয়ে, এই ছিলো তোর মনে! না—আমরা যা বলি তা তোকে করতেই হবে, বুঝলি—করতেই

হবে তোকে। এ কি ইয়ার্কি পেয়েছিস নাকি তুই? তোর বিয়ের কথা ভেবে-ভেবে এদিকে আমাদের রাত্রে ঘুম হয় না—তোর বাবার চুলগুলো শাদা হ'য়ে যাচ্ছে, দেখছিস না? আর তুই কিনা এখন বলিস—অরুণা, লক্ষ্মী তো, আজকের দিনে কোনো গোঁয়ার্তুমি করিসনে—তুই তো এমন ছিলি না কখনো, তুই তো সুমন্ত্র নোস—কত ঠাণ্ডা, কত ভালো, কত বাধ্য তুই—অরু, আর অশান্তি বাড়াসনে—'

ছু-আঙুলে মাথার ছুদিক চেপে ধ'রে অরুণা বললে: 'পারবো না, কিছুতেই পারবো না আমি।'

বিজয়া অসহায়ের মতো ঘরের দেয়ালের দিকে, তারপর মেয়ের মুখের দিকে, তারপর নিজের হাতের তেলোর দিকে তাকালেন। বেয়াড়া যৌবনের এই স্পর্ধা কী ক'রে ঠেকাবেন তিনি? অরুণা হঠাৎ অনেক বড়ো হ'য়ে উঠলো তাঁর চোখে—সেই তাঁর কোলের মেয়ে, হাজার সুখছুঃখের মেয়ে—সে যেন হঠাৎ স্বতন্ত্র, মস্ত ভয়ংকর একটা সত্তা হ'য়ে উঠলো, বিজয়া তাকে চেনেন না—তাকে কখনো ছাখেননি। আজ প্রথমবার তাকে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

এই ভীষণ নতুন অরুণা আবার বললে: 'তুমি যাও মা, এখন।'

এ যেন আদেশের স্বর, ছু-জনের মধ্যে অরুণাই জয়ী, বিজয়ার গোপন মনে লাগলো সেই চেতনা। দরজার দিকে এক পা এগোলেন তিনি, তারপর হঠাৎ থমকে গেলেন, যেন নতুন কোনো ভয়ের ছায়া দেখে।

ভয়ে-ভয়ে ঢুকলো ছু-পায়ে, বিজয়াকে দেখে বললে, 'বক্সিবাজার থেকে লোক এসেছে।'

'কী বলছে?' শুকনো গলায় বললেন বিজয়া।

'বলছে—ওঁদের চারটের সময় আসবার কথা ছিলো, তিনটের সময় আসবেন—বিকেলের দিকে আরো কী কাজ আছে।' তারপর হৃষীকেশবাবু নিজেই মন্তব্য করলেন :

'হয়তো অন্য কোথাও মেয়ে দেখতেই যাবে। অন্য যে-কোনো লাইনের মতো এতেও আজকাল মারাত্মক কম্পিটিশন।'

নিবিড় অদ্ভুত স্তব্ধতা নামলো ঘরে। বিজয়ার সাহস হ'লো না মেয়ের দিকে তাকাতে, সাহস হ'লো না। কেমন ক'রে তিনি পারবেন প্রচণ্ড একটা ঝড়কে মেয়ের উপর লেলিয়ে দিতে! আতঙ্কে ছোটো হ'য়ে গেলেন তিনি। কী বোকা মেয়েটা, কী বোকা! এখনো ও কিছু বলুক, এখনো বাঁচুক। নয় তো ওর বাপের রাগের অগ্ন্যুৎপাত থেকে কে ওকে বাঁচাবে, কে ওকে রক্ষা করবে তখন? নিজের অজান্তেই তিনি একটু স'রে এলেন, নিজের শরীর দিয়ে অরুণাকে ঢেকে।

কিন্তু অরুণা স'রে এসে বাবার দিকে তাকালো। আস্তে বললে : 'এ-সব কথা আমাকে তো তোমরা কিছু বলোনি।'

হৃষীকেশবাবুর মুখের চামড়া আকৃত্রিম বিস্ময়ে কুঁকড়ে গেলো। —'কী বলছিস? তোকে আবার বলবো কী?'

'ব্যাপারটা যখন আমাকে নিয়েই, তখন আমাকে একটু বলতে পারতে তো।'

হৃষীকেশবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন : 'তুমি ছেলেমানুষ—এ-সব শোনবার দরকার কী তোমার।'

অরুণা এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে : 'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি।'

নীল হ'য়ে গেলো বিজয়ার মুখ। স্নায়ুতে-স্নায়ুতে স্তব্ধ হ'য়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়। এখনো

হয়তো সময় আছে, এখনো হয়তো কিছু ব'লে মেয়েকে বাঁচানো যায়। বলবার চেষ্টাও করলেন—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না।

হৃষীকেশবাবু মৃদু হেসে বললেন : 'তুমি কিছু বলবে?—বলো। তুমি কিছু ভেবো না, তোমাকে সৎপাত্রেই দেবো।'

'বাবা, যে-লোক এসেছে তাকে তুমি ব'লে দাও ওঁরা যেন না আসেন। আমি পারবো না।'

'পারবে না? কী পারবে না তুমি?'

'ওঁদের সামনে যেতে পারবো না।'

'ওঁদের—সামনে—যেতে পারবে না?' হৃষীকেশবাবু থেমে-থেমে কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন—যেন না-বুঝে।

অরুণা আবার বললে, যেন নিজের মনে-মনে : 'পারবো না, কিছুতেই পারবো না আমি।'

হৃষীকেশবাবু একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, একবার স্ত্রীর দিকে। দূর থেকে মেঘের গুরু-গুরু যেমন শোনা যায়, তেমনি স্বরে তিনি বললেন : 'মা-মেয়েতে এই পরামর্শই তাহ'লে চলছিলো এতক্ষণ!'

অরুণা হঠাৎ তীব্র স্বরে ব'লে উঠলো : 'মাকে তুমি কিছু বোলো না, বাবা, মা তো—'

কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে পারলো না, বাজ ভেঙে পড়লো একেবারে মাথার উপর :

'অদৃষ্ট! এতক্ষণে বুঝলাম—সবই অদৃষ্টের চক্রান্ত, নয়তো সকলেই একসঙ্গে আমার শত্রু হবে কেন? সব—সব একত্র হ'য়ে আমার শত্রুতা করছে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার স্ত্রী। মন্তু যেদিন আমাকে মুখের উপর ও-রকম বললে, সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো। কাউকে বলিনি সে-কথা, কিন্তু আমার

বুকের ভিতরটা চৌচির হ'য়ে গিয়েছিলো ও যখন বললে আমার টাকা ও আর চায় না। কিসের স্ত্রী পুত্র কন্যা—সবই টাকার খেলা সংসারে! যতদিন অজস্র টাকা দিতে পেরেছি, ছেলে আমার খুব ভালো; আর এখন অবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়েছে, তাই ছেলে আমার কী বললেন—না, চাইনে আর তোমার টাকা! যেমন ক'রে পারি আমাকে দিতেই হবে যে! ওর জন্মের জন্য আমিই দায়ী।'

হৃষীকেশবাবু অসংলগ্নভাবে হেসে উঠলেন। তাঁর মুখে ক্রোধের আর ক্ষোভের অসংখ্য কুটিল রেখা, কথা বলতে-বলতে তাঁর দুই বলিষ্ঠ বাহু মুগুরের মতো ওঠাপড়া করছে। স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলো মা-মেয়ে।

'আমিই দায়ী—আমি তো সে-কথা জানতুম না, মন্তু আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সে-দায় কি আমি এত বছর ধ'রে বহন করিনি, তিলে-তিলে, পলে-পলে, প্রতি রক্তবিন্দু দিয়েও পিতার কর্তব্য থেকে আমি কি ভ্রষ্ট হয়েছি কখনো? আমার নিজের জীবনের কী সুখ, কী স্বাচ্ছন্দ্য, কী আরাম? সে-কথা মনেও হয়নি কখনো! টাকা উপার্জন কম করিনি জীবনে—তোমাদের সুখের জন্যই সব ঢেলেছি, তাতেই আমার সুখ। মিথ্যা—সব মিথ্যা। আমার বড়ো ছেলে যেদিন আমাকে অমন ক'রে বললে—সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিলো। ওরে তুই তো মেয়ে, তুই তো জন্ম-পর, তোর কথা আবার আমার গায়ে লাগে নাকি? কিন্তু এটা মনে রেখো এখনো তুমি আমারই মেয়ে, এখনো আমার কথা তুমি মানতে বাধ্য। আজ তিনটের সময় যাঁরা আসবেন, তাঁদের সামনে তোমাকে যেতেই হবে, এই আমি ব'লে দিলাম। যদি না যাও—'

হৃষীকেশবাবু দুই বাহু উদ্যত ক'রে ভয়ংকর একটা ভঙ্গি করলেন।

সেটা অভিশাপের না আঘাতের না আত্মধিক্কারের কে বলবে। আর বিজয়া হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে এসে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন: 'পায়ে পড়ি তোমার, ওকে মেরো না। ওকে মেরো না তুমি—ও ছেলেমানুষ, ওর কোনো দোষ নেই।'

অরুণা ছু-হাতে তার মাকে জড়িয়ে ধ'রে টেনে এনে তার বিছানার উপর বসিয়ে দিলে। বললে, 'বাবা, আমাকে তুমি মারতে পারো, আমাকে তুমি মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু ম'রে গেলেও আমি পারবো না।'

'তুমি পারবে না—তুমি তো পারবে না, এদিকে আমার কী দশা হবে? ভদ্রলোকেরা আসবেন—তাঁদের কাছে আমার মান থাকবে কোথায়! কী বলবো আমি তাঁদের, কী ব'লে আমি মুখ দেখাবো তাঁদের কাছে—'

'সেইজন্যই তো বলছি আগেই খবর পাঠাও। ব'লে পাঠাও আমার অসুখ করেছে।'

'তারপর? ছেলের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে—তারপর?'

'তারপর কিছু নেই। এখানে তো আমার বিয়ে হবে না।'

'এখানে তোমার বিয়ে হবে না?'

'না।'

'কেন হবে না জানতে পারি?'

'আমার ইচ্ছে নেই।'

একটা অসংবরণীয় উন্মত্ত ঝোঁকে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো হৃষীকেশবাবুর সমস্ত শরীর। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ব'লে উঠলেন: 'তোমার ইচ্ছে নেই! তোমার জীবনের পরম কল্যাণের চেষ্টায় আমি প্রাণান্ত হচ্ছি—আর তাতে তোমার ইচ্ছে নেই! এখন আমার অবস্থা কী জানো না? তোমার বিয়েতে কতগুলো টাকা লাগবে

জানো না? চাকুরে ছেলের বাপ তো নগদই হেঁকে বসেছেন চার হাজার। তবু আমি পেছ-পা হইনি। ধার ক'রে হোক, যে ক'রে হোক, সে-টাকা আমি জোগাড় করবোই। তুমি সুপাত্রে পড়বে, তুমি সুখী হবে—এ-ই তো আমার আশা। ভদ্রলোকদের আমি কথা দিয়েছি, সব প্রায় ঠিকঠাক—এখন তুমি কিনা বলছো তোমার ইচ্ছে নেই!'

'আমাকে তো আগে কিছু বলোনি। আমাকে না-ব'লে তাঁদের যেমন কথা দিয়েছো—'

'চুপ!' গর্জন ক'রে উঠলেন হৃষীকেশবাবু, 'চুপ করো তুমি! তোমাকে আবার বলবো কী! তোমার আবার ইচ্ছা আর অনিচ্ছা কী! নিজের ভালোমন্দ, নিজের সুখদুঃখ তুমি কি কিছু বোঝো? আমি যা বলবো তা-ই তুমি করবে, তা-ই তুমি করতে বাধ্য। এই আমি ব'লে দিলাম—এই এখানেই তুমি বিয়ে করবে, করবে, করবে। তোমার তুচ্ছ ছেলেমানুষি খেয়ালের জন্য এ-বয়সে আমি অপদস্থ বেইজ্জৎ হ'তে পারবো না।'

অরুণা দ্রুত-পায়ে হেঁটে বাপের একেবারে কাছাকাছি মাথা তুলে দাঁড়ালো, সেই প্রভু-পুরুষের ভীষণ মূর্তির মুখোমুখি।

'তোমার তো ইজ্জৎ আর মান—আর আমার কী? আমার জীবন! আমার সমস্ত জীবন—আমার সমস্ত সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা। আমার জীবন নিয়ে তুমি খেলা করছো কোন অধিকারে? তোমরাই বা কোন কর্তৃত্বের খেয়ালে আমাকে আজ দাবার ঘুঁটি হ'তে হবে, পণ্য হ'তে হবে, রঙিন শাড়ি প'রে গিয়ে দাঁড়াতে হবে অপরিচিত পুরুষের চোখের সামনে রাস্তার নির্লজ্জ স্ত্রীলোকের মতো। আমার বাবা হ'য়ে এ-প্রস্তাব করতে লজ্জায় তুমি ম'রে গেলে না?'

অরুণার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে, চোখ তার উদ্দাম, আগুনে ভরা, চুল তার বিশৃঙ্খল, ছোটো-ছোটো দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ কামড়ে ধরেছে। ভেঙেছে বাঁধ, জেগেছে জোয়ার, এখন সে সব করতে পারে, সব বলতে পারে—এতদিনের চাপা সুড়ঙ্গ-গুমরানি আজ হঠাৎ বেরিয়ে এলো কূল ভাসিয়ে।

স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন হৃষীকেশবাবু মেয়ের এই অভাবিত, অভাবনীয় মূর্তির দিকে। তারপর নিলেন চোখ নামিয়ে, আস্তে বসলেন গিয়ে টেবিলের ধারের চেয়ারটায় মাথা নিচু ক'রে। একটু পরে বললেন :

'এখন বুঝতে পারছি তোমাকে শিক্ষা দিতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই,' তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো অরুণা। 'ঠিক বলেছো। সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছে আমাকে লেখাপড়া শেখানো। যদি আমাকে দিয়ে এই পুতুল-নাচ নাচাতেই তুমি চেয়েছিলে, তাহ'লে উচিত ছিলো আমাকে মূর্খ নির্বোধ নিরক্ষর রাখা। তাহ'লে আমাদের কাউকেই আজ এত দুঃখ পেতে হ'তো না, এত দুঃখ দিতে হ'তো না।'

খাটের এক কোণে মূর্ছিতের মতো প'ড়ে ছিলেন বিজয়া, চেষ্টা ক'রে বললেন : 'অরু, তুই চুপ কর, তুই আর কথা বলিসনে, তুই এদিকে আয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন হৃষীকেশবাবু : 'ঈশ্বর, এ-ও আমার কপালে ছিলো! আমি তো পাপ ক'রে তোদের জন্ম দিইনি—কেন তোরা এমন ক'রে আমাকে মারছিস!'

আর এক মুহূর্তে অরুণার ভিতরটা যেন টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে গেলো। কী সে করেছে, ভালো ক'রে বুঝতেও পারলে না,

ছুটে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে : 'বাবা, শোনো, আমার কথা শোনো।'

হৃষীকেশবাবু ক্লান্ত, আরক্ত চোখে তাকালেন।

'বাবা, আমার উপর রাগ কোরো না, আমি শুধু আর একটা কথা বলবো। তুমি তো পুরুষমানুষ, তুমি তো কত দেখেছো, কত জেনেছো, তুমি বুঝবে। বিয়ে আমি করবো না, এমন কথা তো আমি বলিনি। তোমরা আমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো, বিয়ে আমি করবো। কিছুই ভাবতে হবে না তোমাদের—কত সুখী আমি হবো, কত সুখী তোমরা হবে। সে খুব ভালো, বাবা, সে খুব ভালো।'

হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে হৃষীকেশবাবু ব'লে উঠলেন : 'সে! সে কে? কার কথা বলছো তুমি?'

আর সঙ্গে-সঙ্গে অরুণার হৃৎপিণ্ড পাতালে তলিয়ে গেলো, দুঃস্বপ্নের মতো আতঙ্ক যেন তার কণ্ঠনালী আঁকড়ে ধরলে। রুদ্ধস্বরে বললে, 'বাবা, আমি অশোককে বিয়ে করবো।'

সঙ্গে-সঙ্গে বিজয়া যেন বিদ্যুৎপ্রহৃত হ'য়ে উঠে বসলেন, আর হৃষীকেশবাবুর হুংকারে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠলো—'কী! কী বললে তুমি!'

বিজয়া উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়ে বললেন : 'অশোক! অশোককে বিয়ে করবি!'

'ও, তাই!' হৃষীকেশবাবু অরুণার হাত তাঁর গলা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, ছিটকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো অরুণা। 'তাই! এতক্ষণে বোঝা গেলো ব্যাপারটা। সেইজন্যই ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে থাকবে কেন? মনে যখন কুপ্রবৃত্তি জেগেছে, অন্য-কিছুতে যে ইচ্ছে থাকবেই না!'

আর বিজয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলতে লাগলেন: 'অশোককে তুই বিয়ে করবি কী। পাগল! অশোক যে বদ্যি, ওরা যে অন্য জাত—এমন কথা স্বপ্নেও কী ক'রে ভাবলি তুই! অশোককে তো আমি নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতুম—ও-ছেলে এমন বদ কে জানতো! ও-ই তো নষ্ট করেছে মেয়েটাকে, ও-ই তো মন্ত্র পড়িয়েছে কানে—নয় তো এমন শান্ত, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার—' বিজয়ার গলা বুজে এলো, কথা শেষ করতে পারলেন না।

'আমার রক্তে জন্ম নিয়ে তুই আজ ছেনালি ক'রে বেড়াচ্ছিস।' হৃষীকেশবাবু হাড়-কাঁপানো চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন। 'এমন সন্তান না-থাকলে কী হয়! টুকরো ক'রে তোকে যদি কেটে ফেলি—কী করতে পারিস তুই? উচ্ছন্নে যাবি, প'চে মরবি তুই—বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে কোনো সন্তান কখনো সুখী হয়নি পৃথিবীতে।'

ভয়ে পাগল হ'য়ে গিয়ে অরুণা ছু-হাতে বাবার ছুই পা জড়িয়ে ধরলো।—'বাবা, অমন ক'রে শাপ দিয়ো না—সুখী হবো, আমরা সুখী হবো,' বলতে বলতে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো সে, 'অমন ক'রে শাপ দিয়ো না তুমি। বাবা, মা গো, মা—তোমরা অমত কোরো না—আমি ওকে ভালোবাসি, ভালোবাসি—তুমিও তো মাকে ভালোবাসো বাবা, তেমনি, তেমনি—কিছু অন্যায় নয়, খারাপ নয়, আমরা বিয়ে করবো—বলো তো আজই, এক্ষুনি—ওকে বিয়ে না-করলে আমি বাঁচবো না, বাবা—মা, মা গো—তুমি একটু বলো, তুমি তো বোঝো—আলাদা জাতে কী হয়, এমন তো কতই হচ্ছে আজকাল—মা, তুমিই তো ওকে কত ভালো বলতে, ও তো ভালো, ভালো, সত্যি ভালো—ওর মতো ভালো আর কে—একটু

বলো না, মা, জাত দিয়ে কী হয়, সুখী হওয়াই তো আসল—বাবা, তুমি তো আমাকে সুখী দেখতেই চাও, তবে কেন কিছু বলছো না—বাবা গো—'

অরুণার গলা ভেঙে এলো, চোখের জলে চকচকে চোখে তাকালো মুখ তুলে।

হৃষীকেশবাবু টেনে সরিয়ে নিলেন তাঁর পা দুটো। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তুমি নষ্ট মেয়ে—এখান থেকে যাও।'

তীরের মতো সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো অরুণা। একটা তীর ছুটে যেতে-যেতে যেমন শব্দ করে, তেমনি স্বরে বললে, 'কী! আমি নষ্ট মেয়ে!'

হৃষীকেশবাবু বললেন, 'তোমার ব্যবস্থা পরে করবো—এখন আমার চোখের সামনে থেকে যাও তুমি।'

অরুণা কিছু না-ব'লে মাথাটা একবার ঝাঁকালো, তার শিথিল খোঁপা ভেঙে লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়লো সারা পিঠে। আর তার চোখে কান্না নেই, তার পাৎলা বাঁকা ঠোঁটে ঈষৎ যেন হাসির ছায়া।

একটু সময়, মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে। হঠাৎ বিজয়া আর অরুণা দুজনেই চমকে উঠলো হৃষীকেশবাবুর কণ্ঠস্বরে :

'কী হে, তুমি আবার এখানে কেন?'

দু-জনেরই চোখ একসঙ্গে দরজার দিকে গেলো। সুমন্ত্র। এইমাত্র স্নান ক'রে এসেছে, গায়ে পাৎলা ফুরফুরে পাঞ্জাবি, পরিপাটি আঁচড়ানো চুল। এ-ঘরের কলরব সারা বাড়ি থেকেই অবশ্য শোনা যাচ্ছিলো, সুমন্ত্রও শুনেছিলো। প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, একটু পরেই বুঝেছিলো ব্যাপারটা। সত্যি বলতে, ক-দিন ধ'রে এই বিস্ফোরণেরই সে প্রতীক্ষা করছে। শোনামাত্র তার ঝোঁক হয়েছিলো উপরে ছুটে যেতে, অরুণার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

অতি কষ্টে চেপে গিয়েছিলো সেটা। হাজার হোক, তার তো এতে কিছু নয়। পাছে নিজেকে সামলাতে না-পেরে চ'লে যায়, গেলো স্নান করতে। কিন্তু স্নান ক'রে এসেও দেখলো, থামেনি। এখনো শোনা যাচ্ছে গুমগুম গলা। আহা—বেচারার কত লাঞ্ছনাই না জানি হচ্ছে। তারপর কানে এলো অরুণার একটু কান্নার শব্দ। আর পারলো না। মনস্থির ক'রে চ'লে এলো উপরে।

হৃষীকেশবাবু বললেন: 'এসেছো যখন, খবরটা শুনেই যাও। তোমার ভগ্নী তোমার বন্ধু অশোক সেনকে বিয়ে করতে চায়। রীতিমতো রোমান্টিক শোনাচ্ছে—কী বলো?'

সুমন্ত্র বললে, 'তা বিয়ে করতে চায় করবে, ভালোই তো।'

'আরে তুমি তো এ-কথা বলবেই। তুমি নিজে কোনদিন এ-রকম একটা কাণ্ড করো তার তো কিছু স্থির নেই। কোন এক বেজাত বজ্জাত মেয়ে—তোমার মতো ছেলের কপালে তার বেশি আর কী জুটবে। সে যা-ই হোক, তোমার বন্ধুকে তুমি ব'লে দিয়ো সে যেন আর এ-বাড়ির ছায়া না মাড়ায়।'

'আমার বন্ধুকে আমি নিশ্চয়ই ব'লে দেবো সে যেন আমার বাবার বাড়িতে আর না আসে।'

'বেশ বেশ, তা হ'লেই হ'লো। তোমার যখন নিজের বাড়ি হবে, তুমি তোমার অসভ্য ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে যত খুশি নাচানাচি মাতামাতি কোরো। ঈশ্বরের কাছে এই বলি অতটা যেন আমাকে আর দেখতে না হয়। তার আগেই যেন—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হৃষীকেশবাবু চুপ ক'রে গেলেন।

বিজয়া তাড়াতাড়ি বললেন: 'থাক, থাক, এখন চুপ করো তো তুমি। এই দুপুরবেলায় আর-একটা ষড়জাল বাধিয়ো না। মন্তু, তুই নিচে যা।'

সুমন্ত্র বললে, 'একটা কথা জিগেস ক'রে যাই। এ-বিয়ে কি হবে না ?'

হৃষীকেশবাবু জবাব দিলেন, 'কী হবে না হবে তা তোমার জিগেস করবার তো কোনো দরকার নেই।'

'তার মানেই হবে না। কিন্তু কেন হবে না জানতে পারি ?'

'ফের ! ফের তুমি কথা বলছো, মন্তু !'

অরুণা সুমন্ত্রর কাছে গিয়ে বললে : 'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি তুমি নিচে যাও।'

তবু সুমন্ত্র বললে : 'তুমি যদি সত্যি তোমার মেয়েকে ভালো-বাসতে, তাহ'লে এক্ষুনি এ-বিয়ের ব্যবস্থা করতে।'

শূন্যে হাত ছুঁড়ে গর্জন ক'রে উঠলেন হৃষীকেশবাবু, 'তাই তো, তাই তো ! আমি তো আমার মেয়েকে ভালোবাসিনে, আমি তো আমার ছেলেকে ভালোবাসিনে—কোনোদিন তোদের কাউকে আমি ভালোবাসিনি ! তোকে আগেই চিনেছিলাম, অরুণাকে আজ চিনলাম। এতদিন ধ'রে তোদের জন্য প্রাণ দিয়েছি—আজ তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিচ্ছিস তোরা। অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম বেইমান সব—'

'কী করেছি আমরা যে তুমি এমন ক'রে বলছো ? কী করেছি আমি ? কী করেছে অরুণা ? মেয়েটাকে যে আজ তোমরা এমন ক'রে যন্ত্রণা দিচ্ছো, সাধ্য আছে তোমাদের অশোকের চেয়ে ভালো ছেলের হাতে ওঁকে দিতে পারো !'

'মন্তু, মন্তু—' আর্তস্বরে ডেকে উঠলেন বিজয়া, 'চুপ কর তুই, যা এখান থেকে।'

কিন্তু সুমন্ত্র বলতেই লাগলো : 'দৈবাৎ ও আলাদা জাত, তাতে কী হয়েছে ! এত বড়ো নিষ্ঠুর তোমরা, তোমাদের একটা

কুসংস্কারের জন্য মেয়েটাকে মেরেও ফেলতে পারো! এর নাম ভালোবাসা!'

চীৎকার ক'রে উঠলেন হৃষীকেশবাবু: 'অপোগণ্ড নাবালক শিশু—তোরা কী বুঝবি বাপ-মায়ের প্রাণের কথা! আজ আমি এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে—তোদের যেন কখনো ছেলেমেয়ে না হয়, এ-কষ্ট তোরা যেন কখনো না পাস জীবনে!'

'কেন, কষ্টটা কী? কষ্ট তো তোমরা নিজেরা পাচ্ছো নিজেদের দোষে। ছেলেমেয়েকে কেবল ভালোবাসলেই হয় না, মানুষ হিশেবেও ভাবতে হয় তাদের। কী অন্যায় করেছি আমরা, কখন অকৃতজ্ঞতা করলাম? আমরা আলাদা মানুষ, আমাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তোমাদের সঙ্গে আমরা একাত্ম নই—এই তো আমাদের দোষ! কিন্তু একাত্ম হওয়া কি সম্ভব?'

'এই তো—এই তো দ্যাখো—অরুণা তার দাদার কাছেই দীক্ষা নিয়েছে, তাকে আর দোষ দেবো কী! স্বাধীন—স্বাধীন হয়েছিস তোরা, এই একটা বুলি আজকাল তোদের মুখে। তোরা তো এখন স্বাধীন হলি—কিন্তু আমরা কি কখনো স্বাধীন হ'তে পেয়েছি তোদের নিয়ে! এক-একটি সন্তানকে লালন ক'রে তোলা যে কী, তা তোরা বুঝবি কেমন ক'রে! আর সেখানেই যদি শেষ হ'তো!'

'এ-কথা বার-বার শোনাচ্ছো কেন যে কষ্ট ক'রে আমাদের মানুষ করেছো! সে-কষ্ট তো সকলেই করে, সে তো করবেই! তার জন্য কেউ কি কখনো প্রতিদান চায়? যেটা প্রকৃতিরই নিয়ম সেটার জন্য কি বাহবা চায় কেউ? যত কিছু করেছো আমাদের জন্য এখন কি তারই দ্বিগুণ আদায় ক'রে নিতে চাও জোর খাটিয়ে, অত্যাচার ক'রে?'

অরুণা আবার বললে, সুমন্ত্রর একটা হাত চেপে ধ'রে : 'চুপ করো, দাদা, চুপ করো।'

'ছেলেবেলা থেকে শুনছি,' সুমন্ত্র বলতে লাগলো, 'যে স্নেহ দিয়েই তৃপ্ত, স্নেহ কিছু ফিরিয়ে চায় না। কিন্তু এখন দেখছি যে তোমরা ফিরিয়ে চাও—তোমরা চাও বাধ্যতা, দাসত্ব। ছেলেমেয়েকে চাও নিজের মুঠোর মধ্যে। চাও নিজের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব। তারা কী খাবে, কী পরবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, কখন বেড়াবে, ক-টার সময় শোবে—সব তোমরা ব'লে দেবে। জীবনের তুচ্ছ থেকে বৃহত্তম সমস্ত ব্যাপারে একান্ত মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকবে তোমাদেরই। গৃহ-পালিত পশুরও নিজের আলাদা ইচ্ছে থাকে, তাও তাদের থাকবে না। তবে হ'লো গিয়ে ভালো ছেলে। আর সেই মূঢ় দাসত্বের যেই একটু ত্রুটি হ'লো অমনি জ্ব'লে উঠে বললে—বেইমান নেমকহারাম অকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ! কৃতজ্ঞ থাকে চাকর, ছেলে কখনো কৃতজ্ঞ থাকে?'

'মন্তু,' বিজয়া ব'লে উঠলেন ব্যাকুলভাবে। 'মন্তু, চুপ কর তুই।'

হৃষীকেশবাবু হাত তুলে বললেন : 'বলতে দাও ওকে, বলতে দাও—সব শুনি। এ-বয়সেও অনেকখানি বাকি ছিলো, দেখছি : পূর্ণ হোক। ও তো বলবেই এ-রকম—ও তো জানে না, কত রাত আমাদের জেগে ব'সে কেটেছে ওকে নিয়ে, কত সুখে বাধা পড়েছে, ব্যর্থ হয়েছে কত ইচ্ছা, নষ্ট হয়েছে কত আশা। ও তো জানে না স্বাধীনতা ব'লে আমাদের কিছুই ছিলো না, এখনো নেই, এখনো আমাদের সমস্ত জীবন ওদেরই জন্য। ও তো জানে না শরীরের যত অসংখ্য দুর্ভোগ, মনের যত দুশ্চিন্তা, জানে না ব্যথা, জানে না সমস্যা, জানে না শিশুর প্রতিকারহীন অত্যাচার। বার-বার এমনি কেটেছে ওদের দিয়ে। তারপর আজ যখন ওদের

জীবনের সিংহদরজায় প্রায় পৌঁছিয়ে দিলুম, ওরা আজ বলছে—ও তো তোমরা করতে বাধ্য !'

'বাধ্য নও ?' এক মুহূর্ত দেরি না-ক'রে ব'লে উঠলো সুমন্ত্র। 'আমাদের জলে ভাসিয়ে দিতে পারতে না তো ! আর এ-কথা কি বলবে যে যত কিছু করতে হয়েছে তাতে কেবলই দুর্ভোগ আর দুশ্চিন্তা—তাতে কোনো সুখ ছিলো না, কোনো মাধুর্য ছিলো না ? আর সেই শৈশবটাই যেন চিরকালের—এমনি তোমাদের মনের ভাব। এমন দিন যে আসে যখন আমরা আর শিশু থাকি না, এটাই যেন মনে আনতে পারো না তোমরা। একটা বয়স পর্যন্ত আমাদের জীবন থাকে মা-বাবার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো, কিন্তু একদিন ছেদ আসে, একদিন ছেদ আসতেই হয়, না-এলেই সর্বনাশ। কুড়ি-বাইশ বছরের খোকাখুকু মানেই হাবা। তেমনি একদিন শিশু থাকে মাতৃগর্ভে নাড়ির পাকে-পাকে জড়ানো ; কিন্তু সে-বন্ধন একদিন ছিঁড়ে যায়, সেটাই মুক্তি। পরবর্তী জীবনে আর-একবার আসে সেই ছিন্ন হবার, বিচ্ছিন্ন হবার সময়—সেটাকে স্বীকার ক'রে নিতে না-পারা অপ্রকৃতিস্থতা। তখন নিজের ছেলেমেয়েকেও সম্মান করতে হয় স্বতন্ত্র মানুষ ব'লে। মানুষের-সঙ্গে-মানুষের যে-সহজ অনাড়ষ্ট স্বাধীন সম্বন্ধ, তাছাড়া আর-কোনো সম্বন্ধ তখন টিঁকতেই পারে না। যে-নিবিড় বন্ধন অণুতে-অণুতে মা-বাবার সঙ্গে শিশুর, তখন সেটা ছিঁড়ে ফেলতেই হয়—ছিঁড়ে যায়ই সেটা—নয় তো সে-স্নেহ নাগপাশ হ'য়ে উঠে উভয় পক্ষকেই পিষে মারে। দেখলে তো, এই স্নেহ নিয়ে জবরদস্তি করতে গেলে কী হয় তা দেখলে তো ? একবার এ-কথা তুমি মনে-মনে মেনে নাও যে আমরা বড়ো হয়েছি, তারপর দেখবে কোনো সমস্যাই আর থাকবে না।'

হৃষীকেশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন :

'মন্তু, এত কথা তোমাকে কেন বলতে দিলুম জানিনে। কিন্তু অনেক হয়েছে, আর নয়। তুমি যাও—অরুণা, তুমিও যাও। বেরিয়ে যাও তোমরা আমার চোখের সামনে থেকে, বেরোও এক্ষুনি। যেখানে খুশি যাও, যা ইচ্ছে হয় করো। তোমরা যে আমার কিছু, এটা যেন আমি ভুলতে পারি।'

তারপর আর সারা বাড়িতে চুপি-চুপি একটা কথা বলা হ'লো না। হৃষীকেশবাবু স্নান ক'রে খেলেন, সুমন্ত্র গিয়ে একা-একা খেয়ে এলো। অরুণা নাইলো না, খেলো না, শুয়ে রইলো। বিজয়া প'ড়ে রইলেন না-খেয়ে মেঝেতে পাটি পেতে। বেলা গড়িয়ে চললো, তিনটে বাজলো। ভদ্রলোকেরা এলেন, হৃষীকেশবাবু নিচে গিয়ে কী কথা বললেন তাদের সঙ্গে তা আর-কেউ শুনলো না। ভদ্রলোকেরা চ'লে গেলেন।

*

'টুনকি, শোন।'

টুনকি বারান্দা দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিলো, দিদির ডাকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আয় এখানে।'

টুনকি ঘরে ঢুকে কাছে এলো, নিঃসংকোচে নয়।

তার দু-কাঁধের উপর দু-হাত রেখে অরুণা বললে, 'শোন একটা কথা।'

বড়ো-বড়ো গম্ভীর শিশু-চোখ তুলে তাকালো টুনকি।

'শোন—আমি যদি চ'লে যাই এখান থেকে, কেমন হয় তবে বল তো?'

'যাবে নাকি, দিদি ?'

'বাঃ, যাবো না ? বিয়ে হবে না আমার ? তুই-ই তো বললি সেদিন।'

'কই, বিয়ে তো তোমার হ'লো না। তারা তো ফিরে গেলো।'

'সব খবরই রাখিস দেখছি।'

টুনকি একটু লজ্জিতভাবে বললে, 'মা তো সেইজন্যই এত কাঁদছেন!'

অরুণা হেসে বললে: 'দূর বোকা—মা-রা আবার কাঁদেন নাকি? বড়োরা কি কাঁদে?'

টুনকি চুপি-চুপি বললে: 'তবে তুমি যে—'

'দূ—র! আমি কাঁদি নাকি? পিণ্টু কাঁদে, গোপলা কাঁদে, তুই কাঁদিস—'

টুনকি প্রতিবাদ করলে, 'আমি কাঁদি না।'

অরুণা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: 'শোন, একদিন হয়তো দেখবি আমি চ'লে গেছি।'

'কোথায় যাবে?'

'কোথায় যাবো তা কি জানি?'

'তা আবার আসবে তো—আসবে না? দিদিরা বিয়ে হ'য়ে চ'লে যায়—আবার তো আসে মাঝে-মাঝে, আসে না?'

'সবই তো জানো তুমি বুড়িঠাকরুন। তোমার আর ভাবনা কী।'

টুনকি বললে: 'তুমিও তো আবার আসবে?'

'যদি না আসি?'

'যাঃ!'

'যদি না আসি তবে কি তুই খুব রাগ করবি আমার উপর?'

টুনকি মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো।

অরুণা টুনকির কপালে একটা চুমু খেয়ে বললে: 'রাগ যত খুশি করিস, কিন্তু তোর দিদ্দিকে কখনো খারাপ ব'লে ভাবিসনে—বুঝলি ?'

টুনকি মাথা তুললো; তার চকচকে চোখের উপর চোখের পাতা পড়লো কয়েকবার।

হাত সরিয়ে এনে অরুণা বললে: 'যা এখন।'

টুনকি তবু দাঁড়িয়ে রইলো কোল ঘেঁষে।

অরুণা আবার বললে, 'কক্ষনো আমাকে খারাপ ব'লে ভাবিসনে—কেমন ?'

টুনকি কিছু বললে না, কেমন অদ্ভুত ক'রে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে। হয়তো একটু পরে সে কিছু বলতো, কিন্তু তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন বিজয়া, আর মার পায়ের শব্দ পেয়েই টুনকি পালালো ছুটে।

অরুণা ব'সে ছিলো খাটের ধার ঘেঁষে, বিজয়া তার পাশে গিয়ে বসলেন। বললেন: 'কত আর মন-খারাপ ক'রে থাকবি, অরুণা!'

অরুণা বাঁকা হেসে বললে: 'কই, মন-খারাপ করছি না তো আমি।'

কিন্তু বিজয়া কথাটাকে প্রতিবাদেরও অযোগ্য মনে করলেন।

'মনে-মনে ও-রকম গুমরে-গুমরে শরীরটাকে খারাপ করবি তো ? তাছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। অরু, লক্ষ্মী, এত অবুঝ হোসনে।'

মা হয়তো তার গায়ে একটু হাত বুলুতেই যাচ্ছিলেন, অরুণা হালকা ভঙ্গিতে দূরে স'রে গেলো। বললে: 'থাক মা, এ-সব কথা থাক।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়া বললেন : 'তুই কি পাগল নাকি, অরু, যে ঐ অশোক ছেলেটাকে বিয়ে করবার কথা ভাবলি? তা কি হয় কখনো? ওর যে জাত আলাদা—ওর বাবা জানতে পারলে তিনিই কি রাজি হতেন ভেবেছিস?'

'কেন তুমি বোঝাচ্ছো, মা? আমি তো কিছু বলছি না— তোমাদের কথা সবই তো আমি বুঝি।'

বিজয়া চুপি-চুপি বললেন, অন্তরঙ্গ সুরে : 'ছাখ, ছেলেটার মা নেই, বাড়ির টান নেই—ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, তাই বড়ো মায়া লাগতো। এত আদর-যত্নের প্রতিদানে তোর মনে এই বিষ ঢোকানো কি ওর উচিত হয়েছে? ভেবে ছাখ—তুই-ই বল। যেটা অসম্ভব, যেটা কখনোই হবার নয়, সেটার মধ্যে তোর কাঁচা মনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া—ও যদি সত্যি ভালো হ'তো তাহ'লে কি এমন কাজ করতো কখনো?'

অরুণা জবাব দিলে না ; তার মুখেরও ভাবান্তর হ'লো না।

তেমনি নরম সুরে, তেমনি ঘায়ে-মলম-লাগাবার ঢঙে বিজয়া বলতে লাগলেন : 'আমি বলি তোকে—এ নিয়ে আর ভাবিসনে তুই। এখন খুব কষ্ট লাগছে, কিন্তু এ-কষ্ট বেশিদিন থাকবে না—'

এবার অরুণা একটা মন্তব্য না-ক'রে পারলো না : 'কোন কষ্টই বা বেশিদিন থাকে, মা? ছেলে ম'রে যায়—সে-কষ্টই কি মা-র মনে থাকে চিরকাল?'

ছেলে-মরার প্রসঙ্গে একটু বিচলিত হ'য়ে বিজয়া বললেন, 'কী যে বলিস তুই, অরু, বুদ্ধিসুদ্ধি সবই কি খুইয়েছিস? অশোকের সঙ্গে অনেকদিন দেখাশোনা না-হ'লেই, দেখবি, মনটা বেশ শান্ত হ'য়ে আসছে।'

এবারেও অরুণা জবাব না-দিয়ে পারলে না, 'আমি যদি আজ

নিরুদ্দেশ হ'য়ে হারিয়ে যাই তাহ'লে তুমিও তো প্রথম কয়েকদিন খুব কান্নাকাটি করবে—করবে না? আর তারপর সেটাই তো তোমার স'য়ে যাবে, অভ্যেস হ'য়ে যাবে—যাবে না? তারপর আবার তুমি হাসবে, আবার চাকরদের সঙ্গে খিটিমিটি করবে, আবার দুপুরবেলায় খাওয়ার পরে মাসিকপত্র হাতে নিয়ে শোবেও। সবই করবে। তাই ব'লে কি এটা কি প্রমাণ হ'লো যে তুমি আমাকে ভালোবাসতে না?'

'কী যে বলিস! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করিস তুই!—অরু, আমার কথা শোন, অরু, মনটাকে একটু স্থির কর। তোর অমতে আর-কিছু হবে না। আমরা দেখে-শুনে এমন জায়গাতেই তোর বিয়ে দেবো, যেখানে তোর মত হবে। ছ্যাখ, এমনিতে আমরা এখন নানা দুশ্চিন্তায় বিব্রত, তার উপর আর অশান্তি বাড়াসনে। মন ভালো কর তুই—সবই ঠিক হ'য়ে যাবে দু-দিনে। তোর বাবার উপরে রাগ ক'রে কী করবি—তাঁর কি মাথার ঠিক আছে। জানিস তো তিনি রাগি মানুষ, একবার রাগ উঠলে বলতে না পারেন এমন কথা নেই। তার উপর ছ্যাখ, এই ক-দিন ধ'রে রাত্রে ঘুম নেই তাঁর, মনে নেই মুহূর্তের শান্তি। প্রাণের চেয়ে তিনি ভালোবাসেন তোদের—আর তোরা কি তাঁকে এমন ক'রে কষ্ট দিবি?' বিজয়ার চোখে করুণ মিনতি ফুটে উঠলো।

এটা অবৈধ, এটা হীন, অরুণার মনে হ'লো, মানুষের হৃদয়-বৃত্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জিতে যাবার এই চেষ্টা। হীন এটা। কিন্তু অরুণা, তোমার আবার হৃদয়, আর তোমার আবার স্নেহ-মমতা—তুমি তো নষ্ট মেয়ে। তোমার বাবা তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। নষ্ট মেয়ে তুমি। তোমাকে হাত ধ'রে বলা হচ্ছে, তোমার বাবাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না, নিজে তুমি যত কষ্টই পাও—

দু-দিনেই ভুলে যাবে। তুমি সব সহ্য করবে, তুমি নিজের গলা টিপে ধ'রে শান্ত হবে; আর-কেউ শান্ত হবে না, আর-কেউ কিছু সহ্য করবে না। তুমি তো নষ্ট মেয়ে।

অরুণা উঠে দাঁড়ালো।—'যাই, মা, স্নান করতে, বেলা হ'লো।'

বিজয়া একটু অবাক হ'য়েই তার মুখের দিকে তাকালেন। যেন সবে গানের আলাপ শেষ ক'রে এনেছি এমন সময় শ্রোতা 'বাঃ, বেশ বেশ' ব'লে উঠে দাঁড়ালো।

'তাহ'লে তুই—কী ঠিক করলি?' মেয়ের মুখ থেকে নির্দিষ্ট কিছু শোনার আশা করলেন বিজয়া।

'আমরা কিছু ঠিক করবার কে, মা, অদৃষ্টই ঠিক করে।'

ব'লে অরুণা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, মায়ের মুখের দিকে ভালো ক'রে একবার তাকালোও না। গেলো স্নানের ঘরে। অদৃষ্ট দিয়েছে ঠিক ক'রে, এখন আর কোনো ভাবনা নেই। কাল। কাল সে যাবে। অশোক খবর পাঠিয়েছে সুমন্ত্রকে দিয়ে। সে যাবে। যাবে যাবে যাবে। কোনো ভাবনা আর নেই এখন। সে নষ্ট মেয়ে—তার আবার ভাবনা কী?

*

অন্ধকার। অন্ধকার আর হাওয়া। হু-হু ক'রে, গুমগুম ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। অন্ধকার গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো, রাত্রির বুক ভেঙে গেলো। খাঁচার মতো ছোটো একটি ইণ্টার-ক্লাশ কামরা চার-পাঁচজন যাত্রীর দখলে। জানলার ধারে অরুণা ব'সে, জানলায় হাত রেখে, বাইরের দিকে তাকিয়ে। নির্ঘুম উজ্জ্বলতা তার চোখে। তার পাশে অশোক ঘুমে ঢুলছে, থেকে-থেকে আধো জেগে উঠছে

গাড়ির ঝাঁকুনিতে। অন্যান্য যাত্রীরা শোয়া-বসার বিভিন্ন অবস্থায় ঘুমে বিভোর। গাড়ির গর্জন ছাড়া পৃথিবীতে আর-কিছু নেই।

একটু পরেই শব্দের-ঢেউ-তোলা রাত্রির সমুদ্রে একটা দ্বীপ ভেসে উঠলো। গাড়ি থামলো, স্টেশন। সঙ্গে-সঙ্গে অশোক জেগে উঠলো অস্পষ্ট আধো-ঘুম থেকে, যেমন তন্দ্রার মধ্যে প'ড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে-দেখতে হঠাৎ খাটে পায়ের ধাক্কা লেগে আমরা চমকে জেগে উঠি।

অরুণা মুখ ফিরিয়ে ফিশফিশ ক'রে বললে : 'রানাঘাট!'

'রানাঘাট!' অশোক পুনরুক্তি করলে, স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে।

'আর কত দূর?'

'আর কী? হ'য়ে এলো।'

'হ'য়ে এলো!' অরুণা হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠলো, যেন ভিতর থেকে একটা ঠাণ্ডা উঠলো লাফিয়ে।

'কী?' অশোক সেটা লক্ষ্য করলে। 'কাঁপছো নাকি?'

'না—না,' হাসির চেষ্টা ক'রে অরুণা বললে, 'ও কিছু না।'

জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে অরুণা প্ল্যাটফর্মের দুই সীমান্ত দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ মাথা টেনে আনলো ভিতরে : কেমন ফ্যাকাশে মুখে তাকালো অশোকের দিকে।

'কী হ'লো?' রুদ্ধস্বরে বললে অশোক।

অরুণা কথা না-ব'লে দু-হাতের মধ্যে মুখ লুকোলো। একটু পরে রেল-পুলিশের দু-জন কর্মচারী হেঁটে গেলো প্ল্যাটফর্ম দিয়ে।

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস পড়লো অশোকের। ঢোঁক গিলে ডাকলো, 'অরুণা!'

'উঁ?'

'অরুণা, মুখ তোলো।'

'গেছে?'

'ও কিছু না—শোনো।'

ছাইয়ের মতো মুখ তুলে অরুণা চাপা গলায় বললে, 'পারবো তো?'

'কী—কী পারবো?'

'পারবো তো পৌঁছতে?' অরুণা নিজের মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে গেলো, তারপর মাথার দু-দিকের রগ দুটো টিপে ধরলো দু-আঙুলে।

'আর কী—এসে তো গেলাম,' অত্যন্ত বেশি সহজ হ'তে গিয়ে অশোকের গলা একটু কেঁপে গেলো। 'আবার মাথা ধরলো নাকি?'

'ধরেছে একটু।'

'একটুও ঘুমোলে না!'

'ঘুম!' অরুণা বোকার মতো হী-হী ক'রে হেসে উঠলো একবার। 'আমি যা-ই হোক ফাঁকে-ফাঁকে ঘুমিয়ে নিয়েছি।'

অরুণা ফিশফিশ ক'রে বললে: 'ঐ লোকটাকে ছাখো!'

'কোন?'

অরুণা সেদিকে না-তাকিয়ে বললে, 'তোমার উল্টো দিকের বাঙ্কে—আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!'

অশোক উদাসীনভাবে পুরো কামরাটা দেখে নিলে, সেই লোকটিকেও দেখলে।

'না তো!'

'চেনে নাকি আমাদের?'

'কে জানে।'

'গাড়িটা ছাড়েই বা না কেন!'

নিজের চিন্তার অনুধাবন ক'রে অশোক বললে, 'চেনা হ'লেও তোমাকে আমাকে একসঙ্গে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবে না। সে-ই ভরসা।'

আর-কেউ নামলো না, আর-কেউ উঠলো না, তবু গাড়িটা অকারণে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। এই শেষ ঘণ্টা যেন আর কাটে না। সারা পথ এমনি ক'রেই এসেছে তারা—প্রতি অচেনা দৃষ্টিতে ভয় পেয়ে-পেয়ে, প্রতি কথায় চমকে, প্রতি শব্দে কেঁপে উঠে-উঠে। এবারে শেষ হ'য়ে এলো পথ, ভোর হ'লো ব'লে। ঈশ্বর, এই সময়টুকু আমাদের রক্ষা করো, আর-একটু সময় বাঁচিয়ে রাখো আমাদের।

গাড়ি ছাড়লো। বাঙ্কের লোকটি কনুইয়ে ভর দিয়ে আধো উঠে বসেছিলো, আবার লম্বা হ'য়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আবার অন্ধকার, আবার রাত্রির সমুদ্রে ট্রেনের শব্দের ঢেউ।

জোরে হাওয়া লাগলো, সহজে নিশ্বাস পড়লো দু-জনেরই। এবার তারা একটু গলা খুলে কথা বলতে পারে, গাড়ির এত শব্দ। অশোক খুব সংক্ষেপে বললে, 'ভয়?'

'উঁ?'

'ভয় করছে নাকি?'

'না—না, ভয় কিসের—' অরুণা ঢোঁক গিললো।

অশোক পকেট থেকে একটা জিনিশ বের ক'রে বললে: 'নাও!'

'কী?—ও, চকোলেট!'

'খাও এটা। সারাটা রাস্তা কিছু তো খেলে না।'

'তুমিও তো খেলে না কিছু।'

'তুমি না-খেলে আমি খাই কেমন ক'রে?

'তোমার কি—খিদে পাচ্ছে?'

'প্রচণ্ড। সিগারেটও আর ভালো লাগছে না।'

চকোলেটের রাংতা ছাড়িয়ে অর্ধেকটা ভেঙে অরুণা বললে, 'খাও।'

'আমার এই বিশাল জঠর-গহ্বরে তোমার ঐ একটুখানি চকোলেট কী করবে! তুমিই খাও, একজনের পেট ভরুক অন্তত।'

অরুণা হেসে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও এর সমস্তটায় আমারই পেট ভরবে?'

অশোক পকেট চাপড়ে বললে: 'ভয় নেই—আরো আছে।'

'আরো! সারা রাস্তা তো এই খেতে-খেতেই এলাম—পাহাড় নিয়ে এসেছিলে নাকি চকোলেটের।'

'এর নাম দূরদৃষ্টি—বুঝলে? এরই জোরে মানুষ কৃতী হয়, জয়ী হয়, রাজা হয়—অনেক-কিছু হয়। রাজা হওয়ার রাস্তায় চলেছি কিনা, তাই ঠিক-ঠিক গুণগুলো বর্তেছে।'

আর যে-ক'টা চকোলেট ছিলো, দু-জনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে ফেললে। তারপর অরুণা বললে, 'দ্যাখো তো ঘড়িটা একবার।'

'ঘড়ির দিকে যত ঘন-ঘনই তাকাও, সময়টাকে তো আর এগিয়ে দিতে পারবে না। নৈহাটি ব্যারাকপুর দমদম কলকাতা।' তারপর একই সুরে বললে:

'হোটেল, খাওয়া স্নান, রেজিস্ট্রারের আপিশ; হোটেল, খাওয়া ঘুম। বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, সে সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে।'

'দাদাও শিগগিরই চ'লে আসবে বললে।'

'ট্যুশনি করতে-করতে এম. এ. পাশ করবো, তুমি মাস্টারি করতে-করতে বি. এ. পাশ করবে।'

'কেন, এম. এ. পাশ করতেও পারি না বুঝি?'

'তাও তো বটে। বেশ তাহ'লে। তুমি ফার্স্ট ক্লাশ এম. এ.

হ'য়ে মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল হ'য়ে বসবে, আমাকে তখন তোমার পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ক'রে নিয়ো কিন্তু—পুরুষ ব'লে বাতিল কোরো না।'

অরুণা হেসে উঠলো।

'একটা ভাবনা হচ্ছে। তোমার ঐ হোটেলে উঠে তো স্নান করবো, তখন—' অরুণা কথার মাঝখানে চুপ ক'রে গেলো।

কথাটা বুঝে নিয়ে অশোক বললে: 'ভয় নেই, আমার দূরদৃষ্টির আর-একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছি। আমার ঐ চামড়ার বাক্সটার তলায় গোটাকয়েক শাড়ি আত্মগোপন ক'রে আছে। বেশির ভাগ ঘরোয়া ধরনের, খান দুই শৌখিন। তারই একখানা প'রে তুমি যাবে রেজিস্ট্রার মহাশয়ের সমীপে।'

'বাবাঃ!' অরুণা অবাক হ'য়ে বললে, 'এত জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে অশোক বললে, 'তুমি তো কিছুই আনোনি—না?'

অরুণা মাথা নাড়লো।

'যাকগে—তাতে আর কী? অন্য যে-সব বিচিত্র পরিধেয় তোমাদের মেয়েদের দরকার হয় তা কিনে নিতে পারবে কলকাতায় আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

অরুণা একবার তাকালো, কিছু বললে না।

'ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

'ঘুমোও একটু। শুতেও পারো ইচ্ছে করলে।'

অরুণা বললে, 'না।' তারপর জানলার উপর দু-হাত রেখে মাথা লুকোলো তার মধ্যে। হু-হু হাওয়া, গাড়ি চলেছে পুরো দমে,

অন্ধকারকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে। গাড়ি চলেছে, কলকাতা এলো ব'লে।

রেজিস্ট্রারের আপিশ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে অশোক বললে, 'আর কী। এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন আর ভয় কী।'

উজ্জ্বল কালো চোখ তুলে তাকালো অরুণা। বেলা বারোটা, দুপুর। ঝলসানো শাদা রোদে এই বৃহৎ ব্যস্ত শহর সমস্ত যানবাহন লোকজন বাড়িঘর নিয়ে অরুণার চোখে লাগলো অপরূপ এক সিনেমার ছবির মতো। দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার, যেন অবিশ্বাস্য সুখে।

তাদের বিয়ের দলিলের কাগজটা বিজয়ী নিশানের মতো ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠলো, অশোকের হাতের মুঠোয়। অশোক বললে, 'এই নাও—পৃথিবী।'

অরুণা বললে, 'কাগজখানা সাবধানে পকেটে রেখে দাও—হারিয়ে ফেলো না আবার।'

খুশিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অশোক বলতে লাগলো : 'এখন আমরা কোনদিকে যাই—কোথায় যাই বলো। সমস্ত পৃথিবী এখন আমাদের, আমাদের সমস্ত সময়। এখন আমরা হাওয়ার মতো, এখন আমরা জলের স্রোতের মতো। কেউ আমাদের বাঁধতে পারে না।' তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে :

'চলো হোটেলেই ফিরি। লম্বা ঘুমে লম্বা দিন শেষ হোক।'

ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লো তারা। অরুণা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলো গাড়িটাকে—কিনলো ফুলের তোড়া, কিনলো ফুলের মালা, ধূপকাঠি, অশোক কিনলো সন্দেশ আর সিগারেট।

আর হোটেলের ছোটো ঘরে গিয়ে তারা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে ; বন্ধ ক'রে দিলে পৃথিবীর মুখের উপর। অরুণার পরনে একখানা চাঁপারঙের রেশমি শাড়ি, টুকটুকে লাল পাড়-তোলা—অশোক নিজেই বুদ্ধি ক'রে কিনেছিলো এখানা। অরুণা খুলে দিলে চুল, হোটেলের চায়ের প্লেটে মালা রাখলো, হোটেলের গেলাশে বসালো তোড়াগুলো। ঘরের কোণে জ্বাললো ধূপকাঠি। একটু পরে ঘরের হাওয়া নিবিড় হ'য়ে উঠলো ফুলের গন্ধে আর ধূপের গন্ধে।

অশোক সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলো, অরুণা বললে, 'ওটা এখন থাক, এখানে এসো একটু।'

অশোক দেশলাইটা দু-আঙুলে আলগোছে ধ'রে অরুণার দিকে তাকালো।

'এসো এখানে,' অরুণা বললে।

আর তারপর, হোটেলের সরু খাটে অশোকের পাশে ব'সে হঠাৎ থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো অরুণা, থরথর ক'রে, যেমন ক'রে কচি পাতার গাছ কেঁপে ওঠে ঝড়ের মুখে, তারপর তার কান্না ঝরঝর ক'রে, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে প'ড়ে ঝরঝর ক'রে কাঁদতে লাগলো সে, কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলো, 'মা, মা গো, মা—বাবা, বাবা !' কান্না—আর কান্না—আর অশোক ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে, ভুলে গেলো সিগারেট ধরাতে।

*

'কাল আমরা রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করেছি, ভালো আছি আমাদের জন্য কোনোরকম চিন্তা কোরো না।

অরুণা।'

হৃষীকেশবাবু আপিশ-ঘরে ব'সে চিঠিটা পড়লেন। এক লাইনের চিঠি, তবু সেটুকু পড়তে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর যেন অনেকক্ষণ লাগলো। বিজয়া প'ড়ে আছেন শোকশয্যায়, আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে। তাঁকে চিঠিটা দেখাতে হবে। কোনোরকম চিন্তা করতে হবে না, কোনোরকম চিন্তারই দরকার নেই। এই 'কোনোরকম' কথাটাই ভয়ানক।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হৃষীকেশবাবু উঠে এলেন। সিঁড়ির কাছে বারান্দায় সুমন্ত্র। থমকে দাঁড়ালেন তাকে দেখে।

'ছাখো,' হৃষীকেশবাবু চিঠিটা সুমন্ত্রর হাতে দিলেন।

কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই সুমন্ত্র সেটা ফিরিয়ে দিলে।—'যাক, বিয়ে হ'য়ে গেছে তাহ'লে,' নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মুহূর্তে হৃষীকেশবাবু যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলেন, চোখের পলক পড়ে না। অনেকক্ষণ পর খুব, খুব নিচু গলায় বললে : 'মন্তু, তুমি জানতে?'

'জানতুম,' কথাটা ব'লেই সুমন্ত্র বারান্দা পার হ'য়ে চ'লে গেলো, তার নিজের ঘরে।

বারান্দায় বাইরের লোকদের বসবার জন্য একটা কাঠের বেঞ্চি, হৃষীকেশবাবু সেখানেই ব'সে পড়লেন। চেষ্টা করলেন অন্য কথা ভাবতে। বিকেল হ'লো। এ-সময়টায় বাড়ির সামনেকার উঠোনটা পাড়ার ছেলেদের কলরবে ভ'রে ওঠে রোজ। আজ একেবারে ফাঁকা। তিনি বারণ ক'রে দিয়েছেন। পিন্টু গেছে পাশের বাড়িতে খেলতে—না কি আর-কোথাও গেছে কে জানে। যে চরকিবাজি শিখেছে ছেলেটা।

চুপ ক'রে ব'সে রইলেন হৃষীকেশবাবু, হাতের মুঠোয় অরুণার

চিঠিটা শিথিলভাবে ধরা, কেন উঠে এসেছিলেন কোথায় যাচ্ছিলেন ভুলে গেলেন। উঠোনে লম্বা হ'য়ে ছায়া পড়লো, আর সেই ছায়ারই মতো নিঃশব্দে টুনকি যে কখন এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছে তিনি টের পাননি। টুনকি আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে তার বাবার মুখের দিকে বড়ো-বড়ো ভীরু চোখ মেলে, নিঃশব্দে।

হঠাৎ কিসের একটু শব্দ হ'লো, হৃষীকেশবাবু অস্বাভাবিকরকম চমকে উঠলেন।—'কে—কে ওখানে?' বলতে গিয়ে তাঁর গলা প্রায় ভেঙে গেলো।

টুনকি দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো।

'ও, টুনকি!' মস্ত একটা নিশ্বাস পড়লো হৃষীকেশবাবুর। 'কী রে টুনকি, কী চাই?'

টুনকি বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো, কথা বললো না।

মেয়েটার ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল বুলোতে-বুলোতে হৃষীকেশবাবু ডাকলেন, 'টুনকি!'

'বাবা!' একটু পরে টুনকি আবার ডাকলো, 'বাবা!' আর-কিছু বললে না।'

হৃষীকেশবাবু বললেন, 'কী করছিস রে তুই একা-একা? যা, মীরার সঙ্গে খেলা কর গে।'

টুনকি একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'বাবা, তুমি রাগ কোরো না। দিদি খুব ভালো, দিদি খুব ভালো।'

আস্তে হাত বাড়িয়ে টুনকিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন হৃষীকেশ-বাবু। বোবা গলায় ব'লে উঠলেন, 'আমি রাগিমানুষ তা তো সে জানে। সে তো জানে—তবু আমার উপর রাগ করলো কেন?'

দুই ঢেউ, এক নদী

'দি পাইন্‌স্‌, শিলঙ
১ জুন

'প্রীতিভাজনেষু,

কাল থেকে এমন বৃষ্টি হচ্ছে যে কী বলবো! চেরাপুঞ্জির পুঞ্জীভূত মেঘ দস্যু তাতারের মতো পড়েছে এসে আমাদের ঘাড়ে। মা বলছেন: 'কোন সুখে যে মানুষ এ-সব দেশে আসে! যদি কাপড়-জামার বস্তা হ'য়েই দিন কাটাতে হ'লো, তাহ'লে আর বেঁচে সুখ কী!' তাঁর গায়ে একটি ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট চড়েছে, সেটা হ'লো গিয়ে বস্তা। সেকেলে ছাঁটের জামা, পুরো হাতা, দেখতে অদ্ভুত—কিন্তু দেখতে মন্দ না। কলকাতার পাখার হাওয়ায় হালকা জামা-কাপড়েই মা থাকেন ভালো, উপরন্তু কিছু হ'লেই তাঁর উৎপাত মনে হয়। আবার কোনো-কোনো লোক দেখেছি, জামা-কাপড় পরতে পারবে বলেই তারা পাহাড়ে আসে। আমাদের অমৃত সরকারকে নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি। 'এ-পোড়া দেশে কাপড়-চোপড় প'রেও কি ছাই সুখ আছে!' সর্বদাই এ-আপশোষ তাঁর মুখে। কিছুকাল য়োরোপের জলবায়ু সেবন ক'রে এসেছেন, বাক্স বোঝাই বণ্ড স্ট্রিটের পোশাক, ল্যাব্রাডর কোট সীলস্কিন টুপিও নাকি বাদ পড়েনি। ভদ্রলোকের দুঃখের কথা একবার ভাবুন। এত ভালো-ভালো পোশাক—বছরে একটি দিন বের করতে পারেন না। দয়া হয় না!

বাবা শালমুড়ি দিয়ে ম্যান অ্যাণ্ড দি ইউনিভর্স নামে এক বিরাট পুঁথি পড়ছেন। এক ফাঁকে আমি ও-বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেখেছি: আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, এক বর্ণও বুঝিনি। বইয়ের

এ-রকম নাম শুনলেই আমি যেন অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করি। নিতান্ত অজ্ঞ আমি, নিতান্ত মূর্খ: মানুষের জীবনের এই যে বিরাট একখানা কাণ্ড এতকাল ধ'রে চ'লে আসছে, সেটা তলিয়ে দেখবার কৌতূহল কখনোই হয় না। নিজের জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে এত বেশি ভালো লাগে যে তার বাইরে—কি তার আড়ালে—কী আছে না আছে সেটা মনেই পড়ে না কখনো। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, এ-সব জেনে কী হয়? এ কি আমাদের বেশী সুখী হ'তে সাহায্য করে? তাছাড়া, এই জানারই বা নিশ্চয়তা কী? দেখতেই তো পাচ্ছেন, ঘন-ঘন সব বদলাচ্ছে: তবু মানুষ যে-যুগে বাস করছে, সে-যুগের সমস্ত ধারণাই অভ্রান্ত সত্য ব'লে অনায়াসে মেনে নিচ্ছে।

যাকগে, সম্প্রতি আমার খুব বেশি ভালোও লাগছে না। বর্ষাতি চড়িয়ে পাইন-সুগন্ধি পথে-পথে ঘোরা, একা ব'সে-ব'সে পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাওয়া—বড়ো জোর টপসির সঙ্গে একটু খেলা, এ ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পাইনে। মাঝে-মাঝে একটা কী-চাই-কী-চাই-বচন-না-পাই-মন-কেমন-রে গোছের ভাব এসে এই বৃষ্টি-পড়া দিনগুলিকে আরো উন্মন ক'রে দেয়। এখানে আমরা এসেছি আজ বেশ কিছুদিন হ'লো, কিন্তু এ-পর্যন্ত আমার একজনও 'বন্ধু' হ'লো না। আপনি তো বলেন মেয়েতে-মেয়েতে বন্ধুতা হবার পক্ষে রেলগাড়ির এক কামরায় এক ঘণ্টাই যথেষ্ট: মেয়েদের মনের বিষয়ে এমনি অনেক অসাধারণ খবর আপনার কাছ থেকে মাঝে-মাঝেই পাওয়া গেছে। এখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'লে না-হয় পুরুষদের অন্তরের রহস্য এমনি উদ্ঘাটন ক'রে সময় কাটানো যেতো: তারপর আমাদের গবেষণার ফলাফল একটি সুনিপুণ পার্সেলে পাঠিয়ে দিতুম আপনার কাছে—তাতে আপনার পুরুষ-বক্ষের

কোনোখানে এতটুকু আঁচড়ও লাগতো না, এ-কথা দয়া ক'রে বলবেন না।

বাজে বকছি। কিন্তু বৃষ্টিতে বন্ধ ঘরে একা ব'সে-ব'সে বাজে না-ব'কে উপায় কী? একটা বই পর্যন্ত নেই যে পড়ি। সেবারে রাঁচি যাবার সময় বাক্স বোঝাই ক'রে বই নিয়ে গিয়েছিলুম— নির্জন অবসরে প্রাণ ভ'রে প'ড়ে নেবো ব'লে। ছু-মাস পরে কলকাতায় যখন ফিরে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী'র সাড়ে-তিন পৃষ্ঠা আর ভার্জিনিয়া উলফের একটি উপন্যাসের প্রথম কয়েক লাইন পড়েছি। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে এবারে কোনো বই-ই আনিনি—এখন দেখছেন তো অবস্থাটা। 'অভিজ্ঞতা'য় মানুষের কোনো শিক্ষাই হয় না, এই একটা শিক্ষা আমার হ'লো। প্রতি বারের অভিজ্ঞতাই নতুন।

আচ্ছা, বলতে পারেন কেন মানুষের সময় কাটে না? সময় কাটে না ব'লেই তো এত বই, গ্রামোফোন আর রেডিও, ফুটবল আর সিনেমা। তবু কেন সময় কাটে না বলতে পারেন?

মায়া'

'পুনশ্চ—শেষের প্রশ্নটার জবাব প্রত্যাশা করি না; তাছাড়া, আপনি তো আজকাল চিঠিপত্র লেখা ছেড়েই দিয়েছেন।'

'—লারমিনি স্ট্রিট

৪ জুন

প্রীতিভাজনাসু,

আপনার ওখানে মন-কেমন-করা মেঘলা দিন, আর এখানে…। খুব কবিত্ব ক'রে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, সামলে গেলুম। আপনার আগের চিঠির জবাব লিখিনি; তবু যে আপনি আরো

একখানা চিঠি লিখেছেন সেটা আপনার দয়া ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য জবাব লেখা বললে ঠিক কথাটা বলা হয় না। ব্যবসায়িক চিঠির অবিলম্বে জবাব আসার নিয়ম: সেখানে জিজ্ঞাসা আছে, সুতরাং তার উত্তরও আছে। কিন্তু আপনার আমার এ-চিঠিগুলো অবসরের ভরা জলে ছোটো-ছোটো ঢেউ, খেয়ালের হাওয়া-লাগা, এক-একটা ঝোঁকের ধাক্কায় ছলছলিয়ে ওঠে। সত্যি বলতে, ক-দিন ধ'রে সেই ঝোঁকটা ছিলো না আমার মনে; সারাদিন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আর পবিত্র পৈতৃক উপদেশ শুনে-শুনে কী-রকম ম'রে ছিলাম যেন। সে-অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে বসলে লেখা হ'তো, কিন্তু চিঠি হ'তো না। আমার অবস্থা বুঝে আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।

স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কখনো যদি কোনো মন্তব্য ক'রে থাকি, আমার সে-ঔদ্ধত্য আপনার বিদ্রূপ-বাণে খানখান হ'য়ে গেছে। বলতে দোষ নেই, এ-বিষয়ে আমি নিতান্তই অর্বাচীন; আমার সব মতামত (শুনতে যতই গম্ভীর ও 'অভিজ্ঞ' হোক) উপন্যাস ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত। আর উপন্যাস পড়া বিষয়েও আপনার সমকক্ষ কোনো-কালে আমি হ'তে পারবো না। আপনার মুখে নানা বইয়ের নাম শুনি, খুব একটা সহজ স্বচ্ছন্দ হাসির আড়ালে নিজের অযোগ্যতা চাপা দেবারই চেষ্টা করি। ব্যর্থ চেষ্টা, বলাই বাহুল্য। আমার চোখের সামনে সাক্ষাৎ মূর্তিমতী আপনি থাকতেও আমি করবো মেয়েদের নিয়ে মন্তব্য! খেপেছেন!

কিন্তু সম্প্রতি আর-একটি মেয়ের হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে। (আর-একটি বললুম: তার মানে এ নয় যে আপনার হৃদয়ের রহস্য আমি কিছু জানি। সত্যি বলুন তো—আপনি উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন আর টপসিকে ভালোবাসেন,

আর সুন্দর চিঠি লেখেন, এ ছাড়া আর-কিছু কি জানি আপনার সম্বন্ধে?) কিন্তু যে-মেয়েটির কথা বলছি, তাকে বুঝতে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিও লাগে না, তার বর্তমান অবস্থা একেবারেই স্বপ্রকাশ। আমার মা-বাবার মতো যারা ইচ্ছে ক'রে অন্ধ নয়, তারা দেখেই বুঝতে পারে। এ-ব্যাপারটা আমার পক্ষে ফার্স্ট হ্যাণ্ড এক্সপীরিয়ন্স, কোনো বইয়ে পড়া ঘটনা নয়, সুতরাং এটা নিয়ে কিঞ্চিৎ গর্ব বোধ না-ক'রে পারছি না। এর পরে বন্ধুমহলে প্রণয়-তত্ত্ব নিয়ে কোনো তর্ক উঠলে এই প্রত্যক্ষদর্শনের জোরে অথরিটি সেজে কিছু বলতে পারবো এমন ভরসা রাখি।

তাহ'লে সমস্তটাই বলি। মেয়েটি আর-কেউ নয়, আমার বোন। নাম তার অরুণা, জানি না তার কথা এ-যাবৎ আপনাকে লিখিনি কেন। খুব ভালো মেয়ে সে, আমার বড়ো ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে তার আলাপ হোক। কোনোদিন হবে হয়তো। আর-একটি মানুষের পরিচয় দিতে হচ্ছে, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু অশোক সেন। এখন অরুণা আর অশোক—এ পর্যন্ত কেমন লাগছে?

যেমন চৈত্রমাসে থেকে-থেকে দক্ষিণে হাওয়া বয়, তেমনি এই দু-জনের রোমান্সের হাওয়া ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগাচ্ছে আমাকে; এরা দু-জনে রচনা করেছে যে-স্বতন্ত্র রহস্যলোক আমি সেটা টের পাচ্ছি আভাসে ইঙ্গিতে হঠাৎ সুগন্ধে। এটা কেমন? যেমন কিনা পাশের ঘরে ব'সে একজন শেলাইয়ের কল চালাচ্ছে আর গুনগুন গান করছে: কলের শব্দ কখনো ছাপিয়ে উঠছে গানকে, কখনো গানের নিচে কলের শব্দ পড়ছে চাপা; আবার কখনো কল আর গান দু-ই থেমে যাচ্ছে একসঙ্গে, সেই বিরতির ফাঁকে-ফাঁকে শোনা যাচ্ছে চুড়ির টুংটাং: হঠাৎ হাওয়ায় মাঝখানকার পরদা'টা একটু উঠে গেলো, দেখতে পেলুম বড়ো জোর কালো পাড়ের ক্ষণিক বাঁকা

রেখা। এই ঘন রহস্যের মধুর ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে : ভালোই লাগছে। এরা আমাকে এড়িয়ে চলে; হয়তো ভয়ও করে মনে-মনে, কিন্তু আমি যে বুঝেছি তাও এদের বুঝতে বাকি নেই। 'চিরকুমার সভা'র বুড়ো রসিকের পার্টটা বড়ো মজার ; ও-রকম কাউকে পেলে প্রণয়ীরা বেঁচে যায়। কিন্তু আমাকে ও-পার্টে ঠিক মানায় না, তাই আমাকে নিঃশব্দ উদাসীনতার ভান ক'রেই থাকতে হচ্ছে। নিজে কোনোভাবে লিপ্ত না-হ'য়ে বাইরে থেকে প্রণয়কাহিনী অনুসরণ করা—এই ব্যাপারটা মন্দ না ; এখানকার নির্জীব দিনগুলিতে তবু একটু বৈচিত্র্য এলো।

ব্যাপারটাকে এখনো খুব লঘুভাবেই দেখছি ; কিন্তু মনে-মনে আমার ভয় আছে যে শিগগিরই এটা সাংঘাতিক হ'য়ে উঠবে। অশোক সেনের সঙ্গে আমার বোনের জাত মেলে না : এদিকে আমার মা-বাবা···এ-বিষয়ে তাঁদের মনের ভাব তো বুঝতেই পারেন। প্রাণ থাকতে না—এই হবে তাঁদের কথা। আর আশ্চর্য এই যে তাঁরা যেটাকে অবৈধ মনে করেন, এক অতি সুখকর অন্ধ আত্ম-বিশ্বাসে সেটাকে অসম্ভবও মনে করেন। পাগল, এ কি কখনো হ'তে পারে! আমার যেটা মত নয়, পৃথিবীতে সেটা ঘটতেই পারে না—কী চমৎকার পরিতৃপ্ত জীবনদর্শন, ভাবুন তো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দুঃখের, কী নিদারুণ দুঃখের। সেই নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে যখন আঘাত লাগে, সে কি মানুষকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয় না!

আমার মা-বাবা যদি এমন ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক, আত্মতৃপ্ত না হ'তেন তাহ'লে তাঁরা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে যাঁরা অন্ধ, তাঁদের নিয়ে কী হবে বলুন! একদিন তো চোখ খুলতেই হবে, তখন একাধারে অশ্রু-বন্যা আর রোষ-বিস্ফোরণেও কিছু ফল হবে কিনা ভাবছি। আবার এও

ভাবছি : অরুণা কি অতটা সইতে পারবে ? শেষ পর্যন্ত এদেরই হয়তো হার হবে···ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মোট কথা, যে-সংঘর্ষ আসন্ন দেখতে পাচ্ছি, তার যে কী ফল হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে দারুণ দুঃখ ভেঙে পড়বে সকলেরই মাথায়—হয়তো মা-বাবার উপরেই সবচেয়ে বেশি।

যাকগে এ-সব, এবারে আপনার কথা কিছু বলুন, খুব বেশি ক'রেই বলুন।

সুমন্ত্র'

*

বৃষ্টি-কেটে-যাওয়া রোদে-ঝলসানো বাগানে ব'সে মায়া পড়লো এই চিঠি। 'আর-একটি মেয়ের হৃদয়ের রহস্য আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে···' মায়া ভুরু কুঁচকোলো, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। কে—কে সেই মেয়ে ? সে কি খুব সুন্দর দেখতে ? কিন্তু সে-বিষয়ে সুমন্ত্র কিছু লেখেনি। মায়া প'ড়ে গেলো—তারপর ছাড়লো গভীর একটা স্বস্তির নিশ্বাস। ও, বোন। ওর বোন, তা-ই বলো! মায়া তাকিয়ে দেখলো, একটু দূরে টপসি একটা ন্যাকড়ার বল নিয়ে খেলা করছে। তার দিকে চোখ পড়তেই হা-হা ক'রে কাছে ছুটে এলো। তার আদরের আতিশয্যে অস্থির হ'য়ে উঠলো মায়া। ছোট্ট একটা চড় মেরে বললে : 'যা, ভাগ।'

টপসি মায়ার হাতের চিঠিখানা আস্তে কামড়ে ধরলো। ভাবখানা এই—ও-সব থাক এখন, এসো আমার সঙ্গে খেলবে।

মায়া তেড়ে উঠলো : 'চিঠিটা খেতে এলি কোন সাহসে বল তো ? আর কারো কথা তো লেখেনি—ওর বোন যে।'

তারপর চিঠিখানা আগাগোড়া আর-একবার পড়লো। ব্যাপারটা বেশ ঘনিয়ে আসছে ব'লেই তো মনে হয়। সুমন্ত্রর বাবা-মা দেবে না বুঝি আলাদা জাতে বিয়ে? তার মা-বাবা হ'লে কী করতেন? জানে না সে। এ-সব কথা কি জোর ক'রে কেউ বলতে পারে! কার মনে কী আছে কে জানে। মা যা-ই করুন, বাবার নিশ্চয়ই ও-সব কথা কিছু মনেই হ'তো না। মুহূর্তের জন্য, নিজেকে ঐ রকম একটা সংকটে কল্পনা ক'রে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। অত সাহস কি তার হবে? অত দুঃখ পারবে কি সইতে?···

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মায়া খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো, কী ভাবছে নিজেই জানে না। ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে পাইনের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে, মেঘ কেটে গিয়ে কী আশ্চর্য নীল আজকের আকাশ। আর চারদিকের অগাধ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মায়ার বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হ'লো নিজেকে, যেমন আর কখনো হয়নি। কে যেন তাকে কোন কথা দিয়ে ভুলে গেছে; কখন যেন কার আসবার কথা ছিলো, আসেনি। কত পাহাড়ের বাঁকা রেখা দিগন্তে, পথে-পথে কত ঝরনার উচ্ছলতা, আকাশে কত উজ্জ্বল আলো-ছায়ার খেলা চলেছে দিনে-রাত্রে—তবু···তবু। কী নেই, কী যেন নেই।

একটু পরে মায়া মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছোট্ট শাল গায়ের উপর টেনে নিয়ে উদ্ধত ফুলের সারির ভিতর দিয়ে চললো বাড়ির ভিতরে। টপসি তাকে লক্ষ্য ক'রে দিলে পিছনে দৌড়, ন্যাকড়ার বল ফেলে। স্বামিনী ঘরে ঢোকবার আগেই সে ঢুকেছে, দখল ক'রে নিয়েছে টেবিলের তলায় কম্বলের উপর তার নিজের জায়গা। আড়মোড়া ভেঙে গোল হ'য়ে শুয়ে পড়লো টপসি,

আর তার চোখা নাকটার দু-ইঞ্চির মধ্যে জুতোর ডগা রেখে মায়া টেবিলে ব'সে শুরু করলো চিঠি লেখা।

'আপনার এবারের চিঠি প'ড়ে আমার মনটা কেমন যে হ'য়ে গেছে কী ক'রে বলি। আপনাকে ঘিরে এখন যে-রহস্য গ'ড়ে উঠছে, এত দূর থেকে আমাকেও তা হানা দিচ্ছে যেন। আপনার বোন অরুণাকে চিনি না, কিন্তু মনে হয় তাকে যেন চিরকাল ধ'রে তাকে চিনেছি। এমনি সংকটের মুখে কত হৃদয় ঝড়ের পাখির মতো পথ হারিয়েছে তা তো ইতিহাসে পড়েছি, উপন্যাসে পড়েছি। কেউ তারা ছিঁড়ে গেছে, হেরে গেছে; কেউ বা হয়েছে জয়ী। গল্প হিশেবে দুটোই সমান সার্থক, কিন্তু সত্যিকারের জীবনে এ-দুইয়ে কত প্রভেদ, কী ভয়ংকর প্রভেদ। বুক-ভাঙা ট্র্যাজেডির গল্প বানানো এক কথা, আর নিজের জীবনে সেটা প্রত্যক্ষ করা···ভাবতে পারি না। আমার কেবল এই কথাই বার-বার মনে হয়: কেন হয় এমন? সবই নিজের মরজি-মতো চলবে, এমন আশা করা অন্যায় আবদার তাও বুঝি—তবু এ-কথা মনে না-ক'রে পারি না যে যত ট্র্যাজেডি ঘটে সেগুলো প্রায় সবই অকারণ—ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু ইচ্ছেটা কে করবে? দুই পক্ষ পরস্পরকে দোষ দেবে, উভয় পক্ষেরই কিছু বলবার থাকবে নিশ্চয়ই: কিন্তু সত্যি-সত্যি কে যে দোষী তার বিচার কে করে?

'বড়ো সুন্দর রোদ উঠেছে আজ সকালবেলায়; কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে এর পিছনে যেন চিরকালের একটি কান্না প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেন একটা তীব্র বাসনা কেঁদে-কেঁদে ফিরছে, তা বুঝি পূর্ণ হবে না কখনো। মানুষের জীবনে কত যে অপূর্ণতা, কত যে ব্যর্থতার ভগ্নস্তূপ। তবু: জীবনের যেটা সবচেয়ে বড়ো

সার্থকতার উৎস, সেটা যদি শুকিয়ে না যায় তাহ'লে অন্য সমস্তই কি সহ্য করা যায় না? সেখানে বঞ্চিত করা আর অন্নাভাবে হত্যা করা একই কথা।

'আমার এই অসংলগ্ন কথাগুলি মার্জনা করবেন: হয়তো নির্বোধের মতো, হয়তো ছেলেমানুষের মতো আমি ভাবছি, দুঃখ না-দেয়াটা যখন এত সহজ তখন কেন মানুষ দুঃখ দেয় আর সেই সঙ্গে নিজেও দুঃখ পায়? এক-এক সময় আমার মনে হয় আমরা যেন প্রতিজ্ঞাই করেছি পরস্পরকে সুখী হ'তে দেবো না। আমি তো খুব সুখী; সত্যি কথা বলবো, এ-পর্যন্ত আমার জীবনে কোনো দুঃখেরই ছায়া পড়েনি। আমার ইচ্ছে করে সকলেই আমারই মতো সুখী হোক—কেন মানুষ মুখ ম্লান করবে, কেন মানুষ কাঁদবে—কাউকে ভয় করবার কি দয়া করবার প্রয়োজন কেন থাকবেই? আমি জানি পৃথিবীর কত জ্ঞানী, গুণী, কত শ্রেষ্ঠ মানুষ এ-বিষয়ে চিন্তা ক'রে কোনো কূল পাচ্ছেন না; তাঁদের কথা আমি বুঝি না, কিন্তু বাধ্য হ'য়েই এটা বুঝতে হয় যে সমস্যাটা সহজ নয়। কেননা সহজ যদি হ'তো তাহ'লে এতদিনে এটা আর সমস্যাই থাকতো না। অন্য সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের কথাই তখন মনে হয়। যদি কোনোদিন আমার জীবনেও এমনি কঠিন কোনো দুঃখ আসে···

'আপনার বোধহয় মনে হচ্ছে আমি ভীরু, দুর্বল। সত্যি ভীরু আমি। দুঃখে অভ্যস্ত নই ব'লে দুঃখ সম্বন্ধে আমার দারুণ ভয়। আপনার বোনের কথা বার-বার মনে পড়ছে। যদি কোনোদিন ঠিক সময়টি আসে, তাকে জানাবেন, দূর থেকে তার এক নিঃশব্দ বন্ধু তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে; তার হাতের উপর হাত রেখে সে এই কথাই জানাতে চায় যে কোনো ভয় নেই।

মায়া।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুমন্ত্র দ্বিতীয়বার এ-চিঠি পড়লো, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এলো না। একটি নতুন মানুষ হঠাৎ দেখা দিয়েছে তার চোখের সামনে: নাম তার মায়া। যে-মায়াকে সে কলকাতায় চিনেছে, যে-মায়ার সঙ্গে এ-ক'দিন তার পত্রব্যবহার, এ-চিঠি যেন তার লেখা নয়। নাগরিক বক্রোক্তি-বিনিময়ের সরস পরিহাসের ভিতর থেকে হঠাৎ এ কে বেরিয়ে এলো? অস্বস্তির মতো লাগলো সুমন্ত্রর: কিন্তু অতি মধুর অস্বস্তি, এই ঘুম না-আসাটা যেন অদ্ভুত কোনো নেশার মতো। কী লিখবে সুমন্ত্র এ-চিঠির উত্তরে? তার কি সাহস আছে? তার কি সাহস আছে? কিছু সে ভাবলে না, মনে-মনে কোনো কথা সাজাবার চেষ্টা করলে না, আলো-নেবানো ঘরের নিঃশব্দ রাত্রির মধ্যে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলো। আর আস্তে-আস্তে সে যেন অনুভব করলে ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট উপস্থিতি: শুক্লপক্ষের চাঁদ কখন আকাশে উঠে এসেছে, জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে না, কিন্তু মশারির ফাঁক দিয়ে জ্যোছনার আভা এসে পড়েছে বিছানায়। সে জানেনি, সে টের পায়নি, চাঁদ কখন উঠে এসেছে আকাশে, চাঁদ কখন এসে ঢুকেছে তার ঘরের মধ্যে।

'—লারমিনি স্ট্রিট

৮ জুন, রাত্রি

'কালই আপনাকে চিঠি লিখতুম, কিন্তু কাল একটা কাণ্ডই হ'য়ে গেলো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঝড় শুরু হ'য়ে গেছে। প্রথম ঝাপটটা বেশ জোরেই আসে, চমকও লাগায় বেশি—মনে

হয় বুঝি সব নিলে উড়িয়ে। কিন্তু সেটা সামলে উঠতে পারলে তত ভয়ংকর আর মনে হয় না।

প্রথমে একটু ভূমিকা করি। আমার বাবা হচ্ছেন ঘোরতর ইগোয়িস্ট ধরনের মানুষ; তিনি যা করেছেন, তিনি যা বুঝেছেন, তাঁর জীবনে যেটা ঘটেছে, আমাদের মতো সত্তাহীন জীবের পক্ষে সেটাই হচ্ছে মডেল। কোথাও তার কোনো ব্যতিক্রম দেখলে তিনি খেপে যান; তুচ্ছতম থেকে গুরুতম বিষয়ে অতি উচ্চস্বরে নিজের মত জাহির করা ও অন্যের উপর স্থূল জবরদস্তি করা—তাঁর পৌরুষের ধারণা হচ্ছে এই। অথচ তিনি কৃপণ নন, কঠিন নন, কোনোরকম হীনতা নেই তাঁর মধ্যে। যদি তিনি নিজের বাইরে এসে কখনো দেখতে পেতেন—কিন্তু যা হবার নয় তা নিয়ে আপশোষ ক'রে লাভ কী? আমার মা নিতান্ত ভালোমানুষ, একসঙ্গে সবাইকে খুশি করবার চেষ্টায় সর্বদাই হাঁপাচ্ছেন, তাঁর অত্যধিক স্নেহ প্রায়ই অত্যাচার হ'য়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুত রকমের স্নেহ—শরীরে তুচ্ছতম সুখের জন্য কত পরিশ্রম, কিন্তু মনের দিকে তাকাবার ক্ষমতাই নেই। মা-র হয়তো ধারণা, শরীরটা সুখে থাকলেই মানুষ সুখে থাকে: খাবার সময় অকারণে বেশি-বেশি পাতে ফেলে দেয়া (ভুলের ভান ক'রে), আর রাত্রে অতি সযত্নে হাওয়া ক'রে মশারির চারদিক গুঁজে দেয়া—এখানেই কি ভালোবাসার সীমা?

অরুণার কথা তো আগেই বলেছি, কোনো হিশেবেই সে অসাধারণ নয়, কিন্তু ঘটনার চাপে অসাধারণ হ'য়ে উঠছে। অসাধারণ তাকে হ'তেই হ'বে, নয়তো সে বাঁচবে না। এখন হয়েছে কী, মা-বাবা তো এক জায়গায় অরুণার বিয়ের কথাবার্তা চালিয়েছেন, আমরা কেউ কিছু জানতাম না। কাল কথা ছিলো

ওকে তাঁরা 'দেখতে' আসবেন। সব ঠিকঠাক, শুধু এই নাটকের প্রধানা পাত্রী অরুণাকেই কিছু বলা হয়নি। বলবার প্রয়োজন বোধ করেননি কেউ। কিন্তু অরুণা কিনা সোজা ব'লে বসলো, 'না'। তখন বেলা প্রায় দুপুর, কারোরই তখনো স্নানাহার হয়নি—এরই মধ্যে হঠাৎ ভয়ানক একটা গোল বেধে গেলো। নিচে থেকে শুনলুম বাবার গলার আওয়াজ বাজের মতো গুমগুম করছে। আঁচ করলুম এতদিনের নেপথ্য-নাট্য এবার উদ্ঘাটিত হ'লো রঙ্গমঞ্চে। এই নাটকে আমি উইঙ্গস-এ লুকিয়ে বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত হবো, না কি নিজেও একটা পার্ট নিয়ে নেমে পড়বো, সে-বিষয়ে মনস্থির করতে খানিকক্ষণ কাটলো। আমি তখন সবে স্নান ক'রে উঠে চুপচাপ একটু বসেছি; পৃথিবীর কারো সঙ্গেই দাঙ্গা করার মতো মেজাজ তখন আমার নয়। তবু—সংঘর্ষেরও একটা আকর্ষণ আছে বোধহয়; তাই সেই দৃশ্যের ক্লাইমাক্স যখন আসন্ন, এমনি সময়ে প্রবেশ করলেন অযাচিত অপ্রত্যাশিত সুমন্ত্রবাবু।

যে-পার্টটা করলুম সেটা বীরের না ভাঁড়ের বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে যে পার্টটা না-নিলেও চলতো। অরুণার দিক থেকে তার কোনো দরকার ছিলো না। কিন্তু দরকার ছিলো আমার। পৃথিবীতে কত অন্যায় কত অত্যাচার তো চারদিকে হচ্ছে, আমরা সকলেই তো সক্রিয় না হোক নিষ্ক্রিয়ভাবে তার প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু একেবারে চোখের উপর যখন অন্যায় ঘটতে দেখি তখন থামাতে না-পারলেও প্রতিবাদ অন্তত করতেই হবে। করলুম প্রতিবাদ, তার পুরস্কারও পেলুম; কিন্তু অসহায় নারীকে রক্ষা করার গর্ব জুটলো না আমার কপালে। তখনই বুঝলুম অরুণা অসহায় নয়, কারো আশ্রয়ের দরকার নেই তার—পেয়েছে, ও পেয়েছে, নিজের মধ্যে এমন শক্তি পেয়েছে যার সঙ্গে

আর-কিছুরই তুলনা হয় না। নয়তো কী ক'রে এত সাহস হ'লো ঐটুকু মেয়ের যে প্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রান্ত কর্তৃত্বের রক্তচক্ষুর সামনে একবারও বুক কাঁপলো না।

ভদ্রলোকেরা ফিরে গেলেন, নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়লো। বাড়ির হাওয়া যেন চাপা বিদ্যুতের টানা-হেঁচড়ায় গুম হ'য়ে আছে। ভালো লাগে না, পালাতে ইচ্ছে করে। অশোকের আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ হ'য়ে গেছে, অরুণার কানে-কানে চলছে মা-র মধুর উপদেশ-বাণী। আমি আছি দূরে, অরুণার সঙ্গে আমার কোনো কথাও হয়নি—তবু মনে হচ্ছে দ্বিতীয় অঙ্কের পালা শুরু হ'তে দেরি নেই, এবং সেটা যে কোন অন্তর্ধানের বাঁকা রাস্তায় ঘটবে তাও বুঝতে পারছি।

আপাতত এই পর্যন্ত। এখন আমার কথা যদি কিছু শুনতে চান, সে-কথা এই যে হাঁপিয়ে উঠেছি। পালাতে পারলে বাঁচি এবার। ইতিমধ্যে এখানে দু-এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, একদিন ভালো ক'রে বর্ষা নামবে আকাশ-ভরা ঘনঘটায়। কিন্তু ঈশ্বর করুন, তখন যেন আমি কলকাতায় থাকি। কলেজ খোলার আগেই প্রত্যাবর্তনের একটা লাগসই অছিলা এখনো আবিষ্কার করতে পারছি না। আপনারা কবে ফিরবেন?

সুমন্ত্র।'

'দি পাইন্‌স্‌, শিলং
১২ জুন

'হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেলো শিগগিরই আমরা কলকাতায় ফিরবো, এক সপ্তাহের মধ্যেই। জুলাইয়ের প্রথম দিকে ফেরার কথা ছিলো, বাবা হঠাৎ মক্কেলের জরুরি তার পেয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন।

আপনিও আসতে দেরি করবেন না। কলেজ খোলার আগে একদিন চিড়িয়াখানায় যাওয়া যাবে, কী বলেন? না কি গরম হবে? না কি বৃষ্টি হবে? তাহ'লে কোথায় যাবেন বলুন। তবে চলুন শিবপুরের বাগানে, গাছে-গাছে সেখানে—কে বাঁধবে ছড়া? আপনি। কে করবে খোদাই? আমি। এতদিন পর কলকাতার কথা ভাবতে কী ভালোই লাগছে। নাকে আসছে দুপুরবেলার রাস্তার অ্যাসফল্টের গরম গন্ধ—কোথায় লাগে তার কাছে পাইনের হাওয়া।

আজ বড়ো তাড়াতাড়ি। 'আছে চায়ের নেমন্তন্ন এখনো তার সাজ বাকি।' শিলং ছাড়বার আগে আপনার আর-একটা চিঠি যেন পাই।

মায়া।'

পুনশ্চ—কোনোদিন অরুণার সঙ্গে দেখা হবেই, তখন তাকে বলবো—কী বলবো জানিনে, হয়তো অনেক কথাই বলবো। সে কি আসবে কলকাতায়? আর আপনি?

মায়া।'

'—লারমিনি স্ট্রিট
১৫ জুন

'কাল ওরা পালিয়েছে। অরুণা আর অশোক। বাবা বজ্রাহত, মা শয্যাগত। মধ্যবর্তী দূত শ্রীযুক্ত সুমন্ত্রই শুধু আছে দাঁড়িয়ে। বাড়ির একটি জিনিশও অরুণা নেয়নি—আমি ভাবছি আজ কলকাতায় পৌঁছিয়েই অরুণা শাড়ি পাবে কোথায়। বিয়ে হবে আইনত, সে-সব আয়োজন প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যখন টের পাওয়া গেলো, তার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাবা বাড়ির কারো সঙ্গে একটি

কথাও বলেননি। নিয়মিত ক'রে যাচ্ছেন কাজ, আজ কোর্টেও গিয়েছিলেন। আর মা এমন কাঁদছেন! কষ্ট হয়, কিন্তু তাঁরাই তো ঘটালেন এটা। যত দোষই দাও, যা-ই করো, শুধু যে পরস্পরের টানে এরা নিশ্চিত দুঃখের মুখে ঝাঁপ দিতে পারলো, সেটা কি কম কথা? কী আছে এদের, যে-পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে নেকড়ের মতো কামড়া-কামড়ি সেখানে এরা বাঁচবে কেমন ক'রে? অশোক আমারই মতো কলেজে পড়ে, স্কলার্শিপ পায়। যদি বলো এ থেকে এদের সর্বনাশ আসবে তো আসুক না। সর্বনাশ তো কত রকমেরই আছে: নিজের হৃৎপিণ্ডকে নিজের হাতে চেপে থেঁৎলে দেয়াই কি কম সর্বনাশ! আমি তো জানি যে মনে-মনে এরা বাঁচবে, বাঁচবে এরা, বেঁচে গেলো এরা, পৌঁছলো এরা এদের সার্থকতায়। পৃথিবীর কোন সর্বনাশ এখন এদের মারতে পারবে?

অরুণার সঙ্গে শিগগিরই কলকাতায় আপনার দেখা হবে। আরো একজনের সঙ্গে দেখা হবে, সে ছড়া বাঁধতে পারে না সেটা আগে থেকেই জানিয়ে রাখা ভালো। সে এখন এক দুঃখের ছায়া-ভরা বাড়িতে নিঃসঙ্গ বন্দীর মতো, কিন্তু কোন দিগন্তে বুঝি চাঁদ উঠলো, একদিন সে কি উঠে আসবে না প্রত্যাশার আকাশ ভ'রে?

সুমন্ত্র।'

*

হোটেলের যে-ঘরটি অরুণা আর অশোক দখল করেছে সেটি তেতলায়। পুবে জানলা, সে-জানলায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে সার্কুলার রোড আর প্রায় মুখোমুখি শেয়ালদা স্টেশন। সার্কুলার রোডের ও-অংশটা মনোরম নয়; ধুলো উড়ছে, ধোঁয়া উঠছে,

দিনে দু-একবার রাস্তার উপর দিয়ে এঞ্জিনে-টানা কুৎসিত রাবিশের গাড়ির যাওয়াই চাই। হোটেলের ঘরটা অত্যন্ত বেশি বড়ো নয়; দেয়াল ঘেঁষে খাট, আর খাটের বরাবর একটি টেবিল, সেখানে অরুণা দু-একটা বইও রাখে আবার দু-বেলা ওখানেই তাদের খাবার দিয়ে যায়। একটা ড্রেসিংটেবিল ছিলো উল্টো দিকের দেয়ালে, অরুণা সেটা সরিয়ে এনেছে জানলার ধারে, আলো বেশি পাবে। ওদের কারো কিছু লেখাপড়া করতে হ'লে ঘরের একটি-মাত্র চেয়ার টেনে এনে সেই আয়নার টেবিলেই বসতে হয়; আয়নায় নিজের মুখের ছবি বার-বার তপোভঙ্গ ঘটায়। অরুণা চেষ্টা করেছে আয়নাটা এমনভাবে রাখতে যাতে মুখ দেখা না যায়, কিন্তু যত বারই সে সেটাকে ঠেলে তুলে দেয়, ততবারই নেমে পড়ে ঠিক মুখের সামনে।

ঘরটাতে অসুবিধে অনেক; কিন্তু আপাতত ওদের দু-জনের কাছে এর চেয়ে ভালো ঘর পৃথিবীতে নেই। এ-ঘর সবচেয়ে ভালো, কেননা এ-ঘর তাদের। একান্তই তাদের। ইচ্ছে করলেই দরজা বন্ধ করতে পারে তারা। ইচ্ছে করলেই দরজায় তালা দিয়ে যেতে পারে বেরিয়ে। আর, যা-ই বলো, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে বড়ো ভালো লাগে। রাস্তায় কত কিছু। নোংরা, তা ঠিক, ঐ ধোঁয়া-উগরোনো ইস্টেশানটাও দেখতে ভালো নয়, তবু—মোটের উপর কী চমৎকার ভাবো তো। সকাল থেকে চলেছে তো চলেইছে; আবার অনেক, অনেক রাত্রে যদি তাকিয়ে ছাখো, খাঁ-খাঁ করছে প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা, ট্রাম-লাইনগুলো মাঝে-মাঝে গ্যাসের আলোয় চিকচিক করছে, একটা লোক নেই, ঐ পানের দোকানটা শুধু খোলা, হঠাৎ হয়তো একটা ট্যাক্সি ছুটে গেলো খটখট ক'রে। তখনো অদ্ভুত লাগে।

আর ভোরবেলা যখন রোদ আসে ঘরে, একটু এসে পড়ে বিছানায় আড় হ'য়ে—কেউ যেন অতি সূক্ষ্ম আদরে ঘুম ভাঙায় তার। খুব ভোরে অরুণার ঘুম ভেঙে যায়। এত ভোরে কখনো সে আগে ওঠেনি, কিন্তু যে-মুহূর্তে রোদটুকু এসে বিছানায় পড়ে, অরুণার পক্ষে আর যেন শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না। তার ইচ্ছে করে অশোকও উঠুক, কিন্তু অশোক ঘুমের ঘোরেই দু-একটা কথা ব'লে আবার যে পাশ ফেরে, শিয়রে চা নিয়ে ঠেলাঠেলি না-করলে কিছুতেই ওঠে না। ততক্ষণে অরুণা স্নান সেরে নেয়, খুব সচেতন-ভাবে সিঁদুর পরে, অনভ্যস্ত হাতে সিঁদুরের গুঁড়ো রোজই প্রায় নাকের ডগায় লেগে যায়। অশোকের মুখে পাছে রোদ লাগে, জানলা দেয় ভেজিয়ে; পরিষ্কার করে অ্যাশট্রে, অশোকের ধার-করা দুটো-চারটে বই গুছিয়ে রাখে—তবু হোটেলের চাকর চা নিয়ে আসে না।

বেলা সেদিন সাড়ে-আটটা হবে। একটু আগে তাদের চা খাওয়া হ'য়ে গেছে; অশোক সিগারেট ধরিয়ে খবরের-কাগজের চাকরি-খালির পাতাটা খুঁটিয়ে দেখছে, আর অরুণা চোখ বুলোচ্ছে ছবির পাতায়। একটু পরে অশোক ব'লে উঠলো :

'এই যে—পেয়েছি।'

'কী?'

'ম্যাট্রিকুলেশনের ছেলের জন্য মাস্টার দরকার—আমার চেয়ে ভালো কোথায় পাবে?'

'ও।'

'ও বললে যে বড়ো? গায়ে লাগলো না? কড়কড়ে পঁচিশ টাকা মাইনে।'

'এত?' অরুণা হাসলো।

'আরে তোমার জন্যেও আছে যে একটা—এটা হচ্ছে বালিগঞ্জের মৃন্ময়ী স্কুলে—মনে হয় তোমার কথা ভেবেই বিজ্ঞাপনটা লিখেছে।'

'কই, দেখি।'

মুখ বাড়িয়ে সেই ছোটো অক্ষরের বিজ্ঞাপন সযত্নে পড়লো অরুণা।—'একটা চিঠি পাঠালে হয়।'

'পাঠালে হয়! বলো কী তুমি? এক্ষুনি! নিয়ে এসো কাগজ-কলম।'

'লিখলেই হ'য়ে গেলো কিনা।'

'একটা হ'তেই হবে যে! না-হ'লে বাঁচবো কী ক'রে!' এই অতি কঠিন সত্যটা হালকা হাসির ঢঙে উচ্চারণ করলে অশোক।

অরুণাও ঠিক সেই সুরেই বললে: 'না-হ'লে চলবেই না যখন, তখন হবেই।'

অশোক কাগজটা নামিয়ে রেখে বললে: 'এখানে আমরা এসেছি কতদিন হ'লো?'

'একুশ দিন।' এক মুহূর্ত দেরি না-ক'রে অরুণা জবাব দিলে। নিখুঁত হিশেব ছিলো তার মনে। যেদিন তারা ঢাকা ছেড়ে এলো, সে-তারিখ কি সে জীবনে ভুলবে?

'একুশ দিন—না? যা টাকা আছে তাতে আর বড়ো জোর দশ দিন হোটেলের খরচ চলতে পারে।'

'আমার তো মনে হয় ছোটো একটা বাসা নিলে ঢের কম খরচ।'

'না-হয় সিগারেট ছেড়ে দেবো,' নিজের মনের চিন্তার অনুসরণ ক'রে অশোক বললে। 'এমনিও তো আমার শখের ধূমপান।' তার হাতের ফুরিয়ে-আসা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে এমনভাবে সেটা অ্যাশট্রের গর্তে ফেলে দিলে যেন সেটা তার জীবনের শেষ সিগারেট। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: 'একটা বাড়িই

নেবো। বাড়ি মানে অবশ্য দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট। তাতেই কুলিয়ে যাবে।'

'দেড়খানা দিয়েই বা কী হবে,' বললে অরুণা।

'ছু-জনের সম্মিলিত আয় আপাতত যদি পঞ্চাশ টাকা হয়—না, পঞ্চাশ টাকায় কী হবে, কলেজে তো পড়তে হবে ছু-জনকেই। তারপর আস্তে-আস্তে একদিন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের কিছু-একটা হ'য়ে না যাই সেই হচ্ছে ভয়।'

অরুণা বললে, 'আমার আর পড়বার কী দরকার!'

'পাগল! তুমিই তো হচ্ছো ভবিষ্যতের আশা। তুমি যখন মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল হবে, আমি সারাদিন অফুরন্ত আলসেমি করতে পারবো সেই আনন্দেই তো বেঁচে আছি!'

অরুণা ভরা চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

খেতে পাবে কি পাবে না, তাদের এখনকার সমস্যাটা হচ্ছে [illegible] সরল সমস্যা, এক কথাতেই বোঝা যায়। মনে-মনে ছু-জনে অতি স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারছে; কিন্তু তাদের আলোচনার সুরে কখনোই বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে না। ম'রে গেলেও একজন কোনো ভয়ের ভাব দেখাবে না, পাছে অন্যের মনে সেটা সংক্রমিত হয়। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের মধ্যে ওরা এমন কূলে-কূলে ভরা যে অন্য-কিছু ওদের যেন ভালো ক'রে স্পর্শ করতেই পারছে না। পারস্পরিক সংস্পর্শের উত্তাপ জীবনের সকল ব্যাধির বিরুদ্ধে যেন এদের টিকে দিয়ে দিয়েছে। খেতে না-পাওয়াটা অতি ভয়ানক, কিন্তু তার সম্পূর্ণ ভয়াবহতা আঘাত করছে না এদের মনে। এরা যে হালকা সুরে কথা বলছে, তা খানিকটা ইচ্ছাকৃত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কিছু হবেই, কিছু-একটা হবেই: সত্যি-সত্যি তারা তো আর মরতে পারে না। জীবন যখন এমন অপরূপ দিগন্ত

থেকে দিগন্তে খুলে গেলো, তখন কি উঁকি দিতে পারে মৃত্যুর দূত ? তা কি হ'তে পারে ?

সুতরাং অশোক সকালবেলার চা-পানান্তিক মধুর আলস্যে আর-একটা সিগারেট ধরালো, এক মিনিট আগেকার সংকল্প ভুলে গিয়ে। ধোঁয়া বের ক'রে বললে : 'ভেবে দেখছি, একশো টাকার কমে কিছুতেই চলবে না। সকালবেলায় তুমি কলেজে পড়বে আর দুপুরবেলায় স্কুলে পড়াবে ; আমি ঘুরে-ঘুরে ট্যুশানি করবো যে-ক'টা পারি—বন্ধুরা অনেক আশ্বাস দিয়েছে। সারাদিন আমাদের দেখাশোনা হবারই ফুরসৎ নেই ; কিন্তু সারাদিনের কাজের পরে সন্ধেবেলায়—'

'কিন্তু রান্না ? খাওয়া ?' প্রশ্ন করলে অরুণা।

'বাঃ! তুমি আছো কোথায় ? চাকর থাকবে না আমাদের !'

'আবার চাকরও !'

'ছুটির দিনে মাঝে-মাঝে তুমি চাঁদা মাছ আনিয়ে সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এমন রাঁধবে—'

'হায় রে !' দীর্ঘশ্বাস ফেললো অরুণা।

'হেরিডিটিতে যদি এতটুকুও আস্থা থাকে—' বলতে-বলতে অশোক থেমে গেলো। চেয়ে দেখলো, ম্লান হ'য়ে গেছে অরুণার মুখ। অশোকের চোখ তার উপর পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। দু-জনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত অঙ্গীকার ছিলো—কোনো পক্ষেরই পরিবারের কথা অন্য পক্ষ কখনো উল্লেখ করবে না। বিশেষ ক'রে অরুণার মা-বাবার কথা কখনোই যেন কোনো প্রসঙ্গে না ওঠে। এতদিনের মধ্যে ওদের ভুল হয়নি একবারও, পৃথিবীতে ওদের আর-কেউ কোথাও নেই এ-ভান ওদের একেবারে নীরন্ধ্র। আজ হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে অশোকের মুখ দিয়ে

বেরিয়ে যাচ্ছিলো—কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলে। অরুণার ফেরানো মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে কী ব'লে কথাটা শেষ করবে ভেবে পেলো না। মুখ নিচু ক'রে তাকালো খবর-কাগজের পাতায়।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। অশোক বললে: 'আমাদের বিনোদ এসেছে ট্যুশানির খবর নিয়ে। ভগ্নদূত হ'য়ে না-এলেই হয়।'

উঠে গিয়ে খুললে দরজা, খবর-কাগজে জড়ানো কিছু পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে সুমন্ত্র ঢুকলো ঘরে।

'দাদা!' অরুণা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সুমন্ত্র হেসে এগিয়ে এলো। 'বাঃ, ঘরটি তো বেশ। তোর চেহারা খুব ভালো দেখছি, অরুণা।'

অরুণা অভিভূতের মতো অস্পষ্টভাবে বললে: 'কবে এলে তুমি?'

'এই তো আজই এলাম। তারপর অশোক, কেমন আছো বলো। তোমার চিঠির আর জবাব দিইনি—সশরীরে আবির্ভূত হবো ব'লে।'

'কত দেরি করলে তুমি আসতে,' বললে অশোক।

'নিজের ইচ্ছায় নয়, এর আগে আসতে পারলুম না।'

দুই বন্ধু জুতো খুলে খাটের উপর উঠে বসলো, অরুণা বসলো ঘরের একমাত্র চেয়ার কাছে টেনে এনে। জিগেস করলে, 'তোমার গাড়ি আজ এতই দেরিতে এলো? তোমার আর-সব জিনিশ কোথায়?'

'গাড়ি ঠিক সময়েই এসেছে,' সুমন্ত্র লজ্জিতভাবে স্বীকাব করলে। 'হস্টেলে জিনিশপত্র রেখে এলাম।'

'আবার হস্টেলে গিয়েছিলে!' একটু পরে অরুণা বললে: 'আমি

তো কত ভোরে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম—কই, তোমাকে তো দেখলুম না।'

সুমন্ত্র হাসলো। 'ঐ খবর-কাগজে জড়ানো কী-সব আছে ছাখ, তোর জন্যে দিয়েছে। আমসত্ত্ব সরভাজা আচার—এতখানি পথ যে নিরাপদে নিয়ে এলাম সে-কৃতিত্বটা একবার মনে-মনে ভেবে দেখিস।'

সুমন্ত্র বললে, 'তোর জন্যে দিয়েছে'; কে দিয়েছে বললে না। অরুণা আস্তে উঠে গিয়ে পুঁটলিগুলো খুললো; একটা বিস্কুটের টিনে ভাঁজে-ভাঁজে আমসত্ত্ব, তুটো সিগারেটের কৌটোভরা কুলের আর তেঁতুলের আচার—অরুণার সবচেয়ে প্রিয়—আর-একটা টিনে টুকটুকে লাল কড়া পাকের সরভাজা—তা ছাড়াও দেখা গেলো কাগজে জড়ানো একখানা নীল রঙের ঢাকাই জামদানি শাড়ি।

জিনিশগুলো দেখতে-দেখতে ঝাপসা হ'য়ে এলো অরুণার চোখ, তারপর দরদর ক'রে চোখের জল নামলো তার গাল বেয়ে। সে চাপতে চেষ্টা করলে না, লুকোতে চেষ্টা করলে না; নিঃশব্দে ও প্রকাশ্যে কাঁদতে লাগলো।

তু-বন্ধুকে ভান করতে হ'লো যেন সেটা লক্ষ্য করেনি। সুমন্ত্র বললে, 'ব'লে দিয়েছিলো, (কে বলেছিলো বললে না) ইচ্ছে করলে তু-একখানা খেতে পারি স্টিমারে। বুঝলি অরু, ইচ্ছে যে একেবারে করেনি তাও নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য সংযম! এমন কোথাও দেখেছিস?'

অশোক বললে, 'অরুণা, তুমি করছো কী! চা কোথায়? এখনো কি হোটেলের ঐ চিনির সরবৎ খেতে হবে? তোমার খুদে স্টোভ ধরাও—সুমন্ত্র, এ-বেলাটা এখানেই কাটাবে তো?'

সুমন্ত্র অলক্ষ্যে একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়ে বললে: 'আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে—ও-বেলা আসবো আবার।'

'কেন, থেকে যাও না।'

'না, না, সে হয় না।' আর-কোনো অছিলা খুঁজে না-পেয়ে সুমন্ত্র বললে: 'গোটা কয়েক জিনিশ এক্ষুনি না-কিনলে আর চলছে না।'

মায়াদের বাড়ি ভবানীপুরে, যেতে অন্তত আধ ঘণ্টা। দশটার মধ্যে পৌঁছতে হবে, নয়তো দেরি হ'য়ে যায়—যেদিন কলকাতায় পৌঁছবেন, সেদিনই আসবেন কিন্তু,' শেষের চিঠিতে মায়া লিখেছে।

'তাহ'লে বিকেলে নিশ্চয়ই এসো। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কথা আমারও কিছু কম নেই। তবে আপাতত ও-সব কথার চাইতে ঢের ভালো হবে সকলে একসঙ্গে ব'সে চা খাওয়া।' অরুণার কান্নায়-ভেজা মুখের দিকে সহজভাবে তাকিয়ে সুমন্ত্র বললে: 'এই অরুণা—চা কর না একটু।'

অরুণা কান্না থামিয়ে মেঝেতে ব'সে স্টোভ ধরালো, লেগে গেলো চা তৈরি করতে। নিজেদের চায়ের সরঞ্জাম তারা কিনে নিয়েছিলো হোটেলে দু-দিন বসবাসের পরেই। ছোট্ট স্টোভ, ছোট্ট প্যান, গোটাচারেক পেয়ালা, চিনি আর টিনের দুধ; চায়ের জন্য অন্তত কোনো হোটেলওয়ালার মর্জির অধীনে থাকতে রাজি নয় অশোক সেন। চা তৈরি হ'লো, চায়ের সঙ্গে অরুণা সরভাজা পরিবেশন করলে।

অশোক হেসে বললে: 'থাক, থাক, ও-সব তোমারই জন্যে—'

'আহা—আমি রাক্ষস কিনা! তাড়াতাড়ি খেয়ে না-ফেললে প'চে যাবে—'

'এ-যুক্তিটা ভালো বটে,' ব'লে সুমন্ত্র সকলের আগে আস্ত একখানা তুলে মুখে দিলো। 'তুইও খা, অরুণা। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস নেই।'

তিনজনে গল্প করতে-করতে চা খেলো। কথায়-কথায় হাসি-ঠাট্টার ছড়াছড়ি, অরুণাও যোগ দিলে তাতে। তার গালে তখনো কান্নার দাগ লেগে রয়েছে—কিন্তু এখন তার কথা শুনে, তার হাসি শুনে কে বলবে যে একটু আগে সে এত কেঁদেছে। তারপর সুমন্ত্র হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'ও কী! উঠছো নাকি?'

সুমন্ত্র বন্ধুর দিকে ভালো ক'রে না-তাকিয়ে বললে: 'সাড়ে-ন'টা বাজলো।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'হস্টেলের একটি ছেলেকে আবার কথা দিয়ে এসেছি—আর বোলো না, যত সব উৎপাত।' ব'লে সুমন্ত্র হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'যাবে, দাদা, এখনই?' অরুণা সুমন্ত্রর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলো দরজা পর্যন্ত। অশোকও আসছিলো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে র'য়ে গেলো ঘরের মধ্যেই। দু-ভাইবোনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'লো তার এখন একটু দূরে থাকাই ভালো।

দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় এসে সুমন্ত্র আর অরুণা একটু দাঁড়ালো। সুমন্ত্র পকেট থেকে একটা খাম বের ক'রে কিছু না-ব'লে অরুণার হাতে দিলে। খামটা শাদা, উপরে কিছু লেখা নেই। অরুণা খুলে দেখলো ভিতরে একগোছা দশ টাকার নোট—গুনেও দেখলে, কুড়িখানা। তাছাড়া আর-কিছু নেই, একটা চিঠি না, একটা কথা না।

'মা লুকিয়ে দিলেন,' সুমন্ত্র নিচু গলায় বললো।

'আর বাবা?' রুদ্ধস্বরে বললো অরুণা।

'বাবা কিছু বলেননি।'

প্রকাশিত হয়েছে—

দু'টাকা সংস্করণ—

বন্ধুপ্রিয়া—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
চিরবান্ধবী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
একবৃন্তে-দুটিফুল—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রিয়সঙ্গিনী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
বউ কথা কও—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
ঘরের আলো—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কি রূপ হেরিনু—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
পল্লীবধূ—দীনেন্দ্রকুমার রায়
সুচরিতাসু—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ফুলশয্যার রাতে—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
নতুন জীবন সুরু—শ্রীকিরীটিকুমার পাল

আড়াই টাকা সংস্করণ—

প্রিয়া ও প্রিয়—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
লক্ষ্মী এলো ঘরে—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
দুই ঢেউ, এক নদী—বুদ্ধদেব বসু

তিন টাকা সংস্করণ—

আজ শুভদিন—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
তবু মনে রেখো—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চার টাকা সংস্করণ—

জনম্-জনমকে সাথী—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

পাঁচ টাকা সংস্করণ—

ধূপছায়া—তারাশঙ্কর, অবধূত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী···

প্রকাশ-প্রতীক্ষায়—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—আলোকাভিসার

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (দ্বিতলে) ব্লক নং সি, রুম নং ৩, কলিঃ-১২